প্রবর্ত্তক বিজয়কৃষ্ণ

বিপিনচন্দ্র পাল

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৪১

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘো
প্রকাশ প্রেস,
৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

পাঁচ সিকা]

প্রবর্ত্তক বিজয়কৃষ্ণ
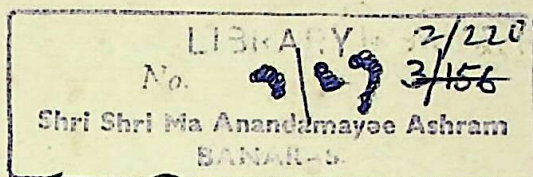
বিষয়-সূচনা

পূজ্যপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবন-চরিত্র লিখিতে চাহি না। শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী কর মহাশয় এ কাজটা বেশ ভাল-রূপেই করিয়াছেন। বঙ্কু-বাবুর গোস্বামী মহাশয়ের জীবনী বাংলা সাহিত্যে জীবনী-গ্রন্থে সর্ব্বদাই অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। তবে যাঁহারা সাধুভক্তদিগের জীবনে অতি-প্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনাই বেশী খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের এই জীবন-চরিত পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন না। সাধনের একটা অবস্থায় লোকে সচরাচর যাহাকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, গুরু-শাস্ত্র-মুখে ইহা শোনা যায়। আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় ইহাকে যোগৈশ্বর্য্য কহিয়া থাকে। গোস্বামী মহাশয় এ সকল যোগৈশ্বর্য্যে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এ সকল ঐশ্বর্য্য লাভ সম্ভব, সাধু-মহাজনদিগের জীবনে বহুবিধ অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া থাকে, ইহা সত্য—এই কথা কহিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও কহিতেন, যে ভক্তেরা সর্ব্বদাই এ সকল ঐশ্বর্য্যকে অত্যন্ত হেয় চক্ষে দেখেন; এ সকলের প্রতি তাঁরা ভ্রূক্ষেপও করেন না; যে এ সকল ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত করে সে কখনও উচ্চ অঙ্গের ভক্তি লাভ করিতে পারে না। গোস্বামী মহাশয়ের মুখে এ সকল উপদেশ যাঁহারা শুনিয়াছেন এবং মননের দ্বারা

অর্থাৎ বিচার পূর্ব্বক এই উপদেশের নিগূঢ় মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে অলৌকিক ঘটনার অনুসন্ধান করিবেন না। এইরূপ ঘটনা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিলেও, তাহার প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন না। মনোনিবেশ করিয়া থাকিলেও, গোস্বামী মহাশয়ের মর্য্যাদা-হানির ভয়ে এ সকল কথা জনসাধারণের মধ্যে কখনই প্রচার করিবেন না। শাস্ত্র-মুখে শোনা যায়, যে মহাপুরুষেরা কখনও কখনও লোক-সংগ্রহার্থে অলৌকিক ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু গোস্বামী মহাশয় কখনও লোক-সংগ্রহের প্রতি দৃক্‌পাত করেন নাই। তিনি ভক্ত সাধক ছিলেন। ভক্তি-সাধনে অনন্যসাধারণ সিদ্ধিলাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি কিম্বা নূতন সাধন-পন্থার প্রতিষ্ঠা তিনি করিতে চাহেন নাই। তিনি সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ নহেন। সুতরাং তিনি কখনও লোকসংগ্রহ করিতে চাহেন নাই। বহু লোকে তাঁহার নিকটে মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু ইহারা স্বতঃই গোস্বামী মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। ইহাদের মধ্যে কাহাকেও তিনি কোনও প্রকারের বাহ্য প্রলোভন দেখাইয়া ডাকিয়া আনেন নাই।

গোস্বামী মহাশয়ের প্রকৃতির ভিতরে, কথাবার্ত্তায় এবং বাহিরের আচার আচরণের মধ্যেই এমন একটা মিষ্টত্ব ছিল, যে তাহাই লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিত। কাহারও শ্রদ্ধালাভের জন্য গোস্বামী মহাশয়ের পক্ষে কোনও প্রকারে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ করা একান্তই নিষ্প্রয়োজন ছিল। সংসার-লীলা করিবার কালে যিনি কখনও কোনও অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া লোক-সংগ্রহ করিতে চাহেন নাই; সে লীলা-সম্বরণের পরে তাঁহার চরিতাখ্যায়িকা লিখিবার বা পড়িবার

সময়ে এ সকল অলৌকিক কাহিনী বিবৃত বা অন্বেষণ করিলে, তাঁহার শিক্ষা এবং সাধনার সত্য মর্য্যাদা-রক্ষা হয় না। বঙ্কু-বাবুর জীবন-চরিতে কোনও প্রকারের অলৌকিকতার উল্লেখ নাই বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থখানি এমন উপাদেয় হইয়াছে। সাধারণ লোকে এ সকল অলৌকিক কাহিনী খুঁজিয়া বেড়ায় ইহা মানি। আর যাঁহারা এই ভাবে সাধুদিগের চরিত্রে কেবল অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের যে এ সকল দেখিবার ও শুনিবার অধিকার নাই, ইহাও জানি। এ সকল অলৌকিক ঘটনা যেখানে সত্যই প্রকাশিত হয়, সেখানেও সাধারণ লোকে তাহার মর্ম্ম ও মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য ভক্ত মহাজনেরা জনসাধারণের সমক্ষে যাহাতে তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ না হয়, সে দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখেন। ভাবাবেশে ক্বচিৎ কখনও নিতান্ত বেসামাল হইয়া পড়িলে এবং এই বেসামাল অবস্থায় লোক-সমক্ষে কোন প্রকারের ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইলে, ভাবাবেশ কাটিয়া গেলে তাঁহারা তজ্জন্য সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন, এবং এসকল ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ যে কিছু নয়, এরূপ ভাবও অনেক সময়ে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে কখনও কোনও প্রকারের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, তিনি নিজে সর্ব্বদাই তাহা গোপন করিয়া রাখিতে চাহিতেন। তাঁহার কোনও কোনও নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্তের মুখে এ কথা বার বার শুনিয়াছি। আর তিনি গোপন করিতে চাহিতেন এইজন্য, যে জনসাধারণ এ সকল ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ দেখিয়া তিনি যে ভক্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবে। যাঁহারা সে আদর্শে সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল ঐ সকল ঐশ্বর্য্য-দর্শনে অধিকারী ; অন্যের সে অধিকার নাই। গোস্বামী মহাশয়

নিজে যাহা এভাবে গোপন করিয়া রাখিতে চাহিতেন, তাহাকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা শোভনও নহে। বঙ্কু-বাবু এ সকল অলৌকিক কাহিনী সংগ্রহ এবং লিপিবদ্ধ করিতে যান নাই বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থখানি এমন সুন্দর হইয়াছে।

গোস্বামী মহাশয় সিদ্ধিলাভের পরে যে সাধন প্রচার করেন, তাহা মাধুর্য্যের সাধন। এ সাধনকেই আমাদের বৈষ্ণব মহাজনেরা ব্রজের সাধন কহিয়া গিয়াছেন। এই সাধনই শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত "অনর্পিতচরী" ভক্তি-সাধন। এই অনর্পিতচরী ভক্তি-সাধনের ধারা শুকাইয়া গিয়াছিল। ক্বচিৎ কোনও কোনও বিরল ভক্তের জীবনে ফল্গু-নদীর স্রোতের মত উহা গোপনে মাত্র প্রবাহিত হইতেছিল। যে ঐশ্বর্য্যে জগৎ আচ্ছন্ন দেখিয়া মহাপ্রভু ঐশ্বর্য্যবিহীন গোপী-প্রেমের আদর্শ প্রচার করেন, সেই ঐশ্বর্য্য বৈষ্ণব সমাজকে পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। ব্রজের ভাব ও ব্রজের সাধনা লোপ পাইয়াছে। ব্রজ-ভাবের গোড়ার কথাই এই, যে ইহার মধ্যে কোনও প্রকারের অলৌকিকতার লেশমাত্র নাই। ব্রজ-ভক্তির সাধ্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ মুরলীধর, চতুর্ভুজ বা ষড়ভুজ নহেন। এই শ্রীকৃষ্ণ যদু-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নহেন; কিন্তু শ্রীনন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ইনি দ্বারকার বা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ নহেন; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ।

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কশ্চিৎ নৈব গচ্ছতি।"

—জীবগোস্বামী—

এই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্য কোথাও গমন করেন না। আর এই বৃন্দাবন মাধুর্য্যের লীলাভূমি। এখানে ঐশ্বর্য্যের প্রবেশাধিকার নাই। দেবতারা ভগবানের ঐশ্বর্য্য-বিকার। এই জন্যই দেবতাদের অতিপ্রাকৃত মূর্ত্তির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন

বৈষ্ণব মহাজনেরা এই প্রচলিত পৌরাণিক দেব-বাদে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু ব্রজে এ সকল দেবতাকে কেশাগ্র পরিমাণ স্থানও দেন নাই। দেব-গোষ্ঠীর বর্ণনায় রাখালেরা মা যশোদাকে কহিতেছেন, যে বনে কত প্রকারের অদ্ভুত লোক আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরতি ও ভজনা করে। ইহাদের কারও বা চার মুখ, কারও বা পাঁচ মুখ। কিন্তু এরা কারা, রাখালেরা জানে না। কারণ ব্রজে, কখনও কারও চারটা হাত বা পাঁচটা মুখ দেখা যায় নাই। ব্রজে সকলেই সহজ মানুষ। সাধারণ মনুষ্য-ধর্ম্মের উপরেই ব্রজের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যকে নষ্ট করে বলিয়া ব্রজ-ভক্তির সাধনা ঐশ্বর্য্যকে এতটা উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। গোস্বামী মহাশয় এই ব্রজ-প্রেমই প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত-চিত্রে ঐশ্বর্য্য ফলাইবার চেষ্টা এই জন্যই এতটা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। যাঁহারা গোস্বামী মহাশয়ের চরিত্রে অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের অন্বেষণ করিবেন, তাঁহাদের তাঁহার জীবনের আলোচনায় অধিকার নাই।

জীবন-চরিত হিসাবে বঙ্কু-বাবুর গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইলেও কোনও কোনও দিক্ দিয়া ইহা অপূর্ণ রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বঙ্কু-বাবু বিশেষ ভাবে গোস্বামী মহাশয়ের জীবনের বাহিরের ঘটনাগুলিই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ জীবনের কথা বলিতে চেষ্টা করেন নাই। বিশেষতঃ, সিদ্ধি-লাভের পরে তাঁহার জীবনে সে সকল রস-লীলার প্রকাশ হইয়াছিল, বঙ্কু-বাবুর গ্রন্থে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে, এই গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ভক্ত সাধকেরা এখানি পড়িয়া সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন না। গোস্বামী মহাশয় সম্বন্ধে যে সকল অন্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও এই ভক্তের অন্তরঙ্গ জীবনের

ছবিটী ফুটিয়া উঠে নাই। বরং অন্য দিকে অলৌকিক ঘটনার বিবরণের প্রাচুর্য্য এই লীলাকে ঢাকিয়াই রাখিয়াছে। গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে যে তত্ত্বের প্রকাশ হইয়াছিল এবং তিনি 'আপনি আচরি' ভক্তি-সাধনের যে পথটী দেখাইয়া গিয়াছেন—কি বঙ্কু-বাবুর গ্রন্থে কিম্বা অন্য কোনও গ্রন্থে তাহা ফুটিয়াছে বলিয়া ধরিতে পারি নাই। ইহা আমারই অক্ষমতা বা গ্রন্থেরই অপূর্ণতা, তাহা কেমন করিয়া বলিব ?

বঙ্কু-বাবুর গ্রন্থে গোস্বামী মহাশয়কে বিশেষ ভাবে একজন সত্যনিষ্ঠ, সাধু-চরিত্র, শ্রদ্ধাবান্ এবং লোকহিতব্রত ব্রাহ্ম-প্রচারক বলিয়াই দেখিতে পাই। তাঁহার চরিত্র ও সাধনার দ্বারা আমাদের আধুনিক ব্রাহ্ম-সমাজকে গোস্বামী মহাশয় কতটা পরিমাণে যে গরীয়ান্ করিয়া গিয়াছেন, বঙ্কু-বাবুর গ্রন্থে ইহা দেখিতে পাই। গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থে এদিক্‌টা একেবারে চাপা পড়িয়াছে। এ সকল গ্রন্থে তাঁহাকে একজন মধ্য-যুগের অতি শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দু সাধক মহাজন-রূপেই দেখিতে পাই। এইরূপ সাধু-মহাজন এখনও এদেশে নানা তীর্থস্থানে রহিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয়কে ইঁহাদেরই একজন বলিয়া মনে হয়। বড় কাঠিয়া বাবা, ছোট কাঠিয়া বাবা, দয়ালদাস বাবাজী, ভোলাগিরি প্রভৃতি যে শ্রেণীর, গোস্বামী মহাশয়কে এই শ্রেণীর একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়াই এই সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহাদের কোনও প্রকারের তুলনা করা অসঙ্গত হইবে। অনেকেরই সঙ্গে গোস্বামী মহাশয়ের পরিচয় এবং আত্মীয়তাও ছিল। গোস্বামী মহাশয় ইঁহাদের প্রতি সর্ব্বদাই অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। ইঁহারাও গোস্বামী মহাশয়কে অতিশয় শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও প্রকারের তুলনা করিবার

চেষ্টা, বিশেষতঃ গোস্বামী মহাশয়ের অনুগতদিগের পক্ষে, অত্যন্ত অপরাধের কথা হইবে।

কিন্তু এ অপরাধ না করিয়াও একথা বলা যাইতে পারে, যে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহাদের অনেক প্রভেদ ছিল। প্রথমতঃ, গোস্বামী মহাশয় যে পথে চলিয়া ক্রমে ব্রজের পথ ধরিয়াছিলেন, ঐ সকল সাধু মহাজনেরা সে পথে চলেন নাই। গোস্বামী মহাশয়ের পথ আমাদের অনেকটা পরিচিত। ছোট কাঠিয়া বাবা বা বড় কাঠিয়া বাবা প্রভৃতি কিম্বা মহাত্মা ভোলাগিরি যে পথে সিদ্ধি লাভ করেন, সে পথের খোঁজ-খবর আমরা জানি না। সে পথ আধুনিক যুগের প্রশস্ত পথ নহে। তাহা মধ্য-যুগের হিন্দু-সাধনার কঠোর পথ। কাঠিয়া বাবা প্রভৃতির সাধন-পন্থার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা করিয়াও এবং তাঁহারা এই পথে যাইয়া যে সিদ্ধি লাভ করেন তাহা অমূল্য দেবদুর্ল্লভ বস্তু, ইহা স্বীকার করিয়াও এ কথা নিঃসঙ্কোচে নিবেদন করিতে পারা যায়, যে আমাদের বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে এই মধ্য-যুগের সাধনা এবং সিদ্ধি সম্পূর্ণ খাপ খায় না। এইজন্য এ সকল সাধু-সন্তের চরণে প্রণাম করিয়া কহিব, যে তাঁহারা ঠিক আমাদের যুগের মানুষ নহেন। কিন্তু গোঁসাইকে আমাদের এ যুগের মানুষ বলিয়াই দেখিয়াছি। এইখানেই গোস্বামী মহাশয়ের সাধনা এবং সিদ্ধির বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বটুকু না ধরিলে গোস্বামী মহাশয়ের চরিত্রের অনুশীলন নিষ্ফল হইবে।

২

প্রত্যেক যুগের সঙ্গে সেই যুগের ধর্ম্মের একটা আন্তরিক সম্বন্ধ থাকে। ধর্ম্ম-বস্তু সনাতন, এ কথা সত্য। কিন্তু ধর্ম্মের প্রাণটাই সনাতন। মানুষের আত্মা যেমন নিত্য, ধর্ম্মেরও সেইরূপ একটা নিত্য স্বরূপ আছে। এই নিত্য স্বরূপেই ধর্ম্ম সনাতন। কিন্তু এই সনাতন ধর্ম্ম-বস্তুই আবার দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নানা ভাবে এবং নানা আকারের আশ্রয়ে নিজেকে ফুটাইয়া তুলে। এই জন্য যুগে যুগে দেশ-কাল-পাত্রের পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন ধর্ম্মের রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। এই যে দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী ধর্ম্ম, ইহাকেই আমাদের সাধনাতে যুগ-ধর্ম্ম কহে। এই যুগ-ধর্ম্ম কথার মর্ম্ম অতি গভীর; ইহার ব্যঞ্জনা অত্যন্ত উদার ও বিস্তৃত; বিশ্বজনীন বলিলেও চলে। এই যুগ-ধর্ম্ম কথাটা অন্য কোনও জাতির বা সাধনার কোষে পাওয়া যায় না। জগতের প্রাচীন ধর্ম্ম সকলই সত্যের একমাত্র প্রতিষ্ঠা ও মানবের মুক্তির একমাত্র পন্থা বলিয়া নিজেদের প্রচার করিয়া থাকেন। এ সকল ধর্ম্ম সত্যের ক্রমাভিব্যক্তি স্বীকার করেন না। সুতরাং দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যে ধর্ম্মের বা সত্যের প্রকাশে কোনও প্রকারের বিভিন্নতা হইতে পারে, আর এরূপ বিভিন্নতার দ্বারা যে সত্য-বস্তুর বা ধর্ম্ম-বস্তুর সনাতনত্বের দাবী নষ্ট হয় না, এ সকল কথা বিদেশী "সনাতনী" ধর্ম্মে স্বীকার করেন না। সুতরাং এ সকল ধর্ম্মে যুগ-ধর্ম্ম বলিয়া কিছু স্বীকৃত হয় না। কিন্তু ভারতের সনাতন সাধনায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে।

> "পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
> ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

—'সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি প্রত্যেক যুগে আবির্ভূত হই।' গীতা এখানে এই যুগ-ধর্ম্মের কথাই কহিতেছেন।

এক যুগের ধর্ম্ম যে আর এক যুগের ধর্ম্ম হইতে পারে না, আমাদের প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারাও ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। ধর্ম্ম-বস্তু যদি কেবল বাহিরের ক্রিয়া-কলাপে আবদ্ধ রহে, ধার্ম্মিকের প্রত্যক্ষ অনুভবের এবং অন্তরের ভাবের উপরে তাহার ধর্ম্মকে গড়িয়া তোলা যদি নিষ্প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেই কেবল এক যুগের ধর্ম্মকে আর এক যুগের উপরে চাপাইতে পারা যায়। কারণ, যুগ-পরিবর্ত্তনে মানুষের জ্ঞানের উপকরণ এবং ভাবের অবলম্বনেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; অনুভবের অতীত, ভাব-সম্পর্ক-বিরহিত বাহ্য অনুষ্ঠানের কোনও অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তন নাও ঘটিতে পারে। আমাদের দেশের প্রাচীন যাজ্ঞিকেরা যে ধর্ম্ম যাজন করিতেন, তাহার সঙ্গে জ্ঞানের বা অনুভবের কোনও সম্পর্ক ছিল না। শুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, যজমান তাহার ফলভাগী হইতেন। তাঁহাদের এইরূপই বিশ্বাস ছিল। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ভাবে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ফল-লাভ হইত, আজিও সে ভাবে সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সেই ফল-লাভ হইবে; যাজ্ঞিকেরা ইহাই কহিবেন।

কিন্তু জ্ঞান-কাণ্ডের কথা এ নহে। ব্রহ্ম-সাধনের মূল ভিত্তি—জ্ঞান। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। 'জ্ঞানেনৈব আপ্নুয়াৎ'—শ্রুতি বারম্বার এই কথা কহিয়াছেন। এই ব্রহ্ম-জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির আর অন্য কোন পথ নাই, ইহাই জ্ঞান-কাণ্ডের কথা। আর জ্ঞান অনুভবের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে বস্তু অনুভবে যাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে না, তাহা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় না—'অনুভূতি-পর্য্যন্তং জ্ঞানং।' এই

অনুভব আবার সাধকের বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয়ের অপেক্ষা রাখে। মানুষ নিজের অন্তরের যে ছাঁচে ঢালিয়া বিষয়-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করে, চারিদিকের নৈসর্গিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ছাঁচটী বদলাইয়া যায়। এই আন্তরিক পরিবর্ত্তন-নিবন্ধন সাধকের জ্ঞান-সাধনের পন্থাও স্বল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এক অবস্থাধীনে যে ভাবে সাধকের ব্রহ্মানুভূতি-লাভ হয়, তাহার বিপরীত অবস্থাধীনে সে পথে সেই জ্ঞান-সাধন অসাধ্য না হউক, নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, সন্দেহ নাই।

প্রাচীন পন্থার অনুসরণে বর্ত্তমানে কেহই যে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, এমন বলা যায় না। অসাধারণ শক্তিশালী লোকে অনেক সময়ে নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারেন। এরূপ শক্তিশালী সাধকের পক্ষে বর্ত্তমান যুগেও প্রাচীন পথে ধর্ম্ম-সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করা অসাধ্য নহে। অসাধ্য হইলে, বর্ত্তমানে এদেশে যে সকল সাধু মহাজন ও সিদ্ধ মহাপুরুষেরা আছেন এবং যাঁহারা আছেন বলিয়াই এখনও প্রাচীন সাধনের মর্য্যাদা রক্ষা পাইতেছে, তাঁহাদিগকে আমরা খুঁজিয়াই পাইতাম না। কিন্তু অলোকসামান্য শক্তিশালী সাধকের পক্ষে যাহা সম্ভব, সাধারণ সাধকের পক্ষে তাহা অসাধ্য।

আর ধর্ম্ম এবং মুক্তি যাহাতে আপামর সাধারণের সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহার পথ দেখাইবার জন্যই যুগে যুগে সেই সেই যুগের উপযোগী যুগ-ধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকে। এ কাজটী সেই সেই যুগের মানুষ যাঁহারা তাঁহারা যেমন সহজে করিতে পারেন, অন্যে সেরূপ পারেন না। এ সকল 'যুগের মানুষ' নিজ নিজ যুগের মূল জ্ঞান এবং ভাবের স্রোতের সঙ্গে একাত্মতা সাধন করিয়া, সেই যুগের যুগ-ধর্ম্মে অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন।

গোস্বামী মহাশয় আমাদের এই যুগের 'যুগের মানুষ' ছিলেন। আপনার সাধন-সম্পদের দ্বারা অচ্যুত-পদ লাভ করিয়া তিনি এক দিকে সকল যুগের সাধনকেই অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা সত্য। এই জন্যই আমাদের প্রচীন পন্থার বৈদান্তিক ভক্তদিগের, নানকপন্থী সন্ত-দিগের, বৈষ্ণব মহাজনদিগের এবং মুসলমান সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ-দিগের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সকল সম্প্রদায়ের সাধু ভক্তেরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিজেদের সমান আসন দান করিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ও এ সকল প্রাচীন পন্থার সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষদিগকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম-জীবনে এমন একটা অবস্থা আছে, যে অবস্থায় দেশ-কালাদির ভেদাভেদ একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধক বিশ্বের মধ্যে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বাত্মৈকত্ব লাভ করেন। এই অবস্থা-লাভে সাধকের জীবনে ও সাধনে যুগ-ধর্ম্ম এক হইয়া যায়। এই অবস্থা-লাভ না হইলে কেহ যুগ-ধর্ম্মেরও প্রকৃত মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে পারেন না, বিশ্ব-ধর্ম্মকেও সত্য ভাবে অন্তরে ধারণ করিতে সমর্থ হন না। গোস্বামী মহাশয়ের এই অচ্যুত-পদ-লাভ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি বর্ত্তমান যুগের 'যুগের মানুষ' হইয়াও এই যুগের সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ রহেন নাই। এই যুগের একদেশদর্শিতা তাঁহার জ্ঞানাঙ্গ আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। এই যুগের কামপ্রধান সভ্যতার ইন্দ্রিয়-লালসা তাঁহার চরিত্র বা চিত্তকে কখনই স্পর্শ করিতে পারে নাই। অথচ এই সভ্যতার ভিতরে যে উচ্ছ্বসিত রস-ধারা বুকের উপরে অশেষ প্রকারের জঞ্জাল লইয়াই বিবিধ তরঙ্গ-ভঙ্গে নাচিয়া কুঁদিয়া নিখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের দিকে অজ্ঞাতসারে হউক কিম্বা জ্ঞাতসারে হউক ছুটিয়াছে,

এই রস-ধারাকে এবং বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকে তিনি কখনও 'সয়তানের ফাঁদ' বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহেন নাই; কিন্তু সর্ব্বদাই এই যুগের এই জ্ঞান-লীলা ও রস-লীলাকে নিজের বিশুদ্ধ চিত্তের ছাঁকুনী দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সম্ভোগ করিতেন। এই সকল কারণেই গোস্বামী মহাশয়কে বিশেষ ভাবে আমাদের এই বর্ত্তমান যুগের 'যুগের মানুষ' বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

৩

আমরা যাহাকে বর্ত্তমান যুগ কহি, তাহার প্রভাব আধুনিক জগতের সর্ব্বত্র ছাইয়া আছে। এই যুগ কোনও দেশ-বিশেষের যুগ নহে। এই যুগ যেমন ইউরোপের সেইরূপ এশিয়ার; যেমন মার্কিণের, সেইরূপ ভারতের। কোনও কোনও দিক্ দিয়া দেখিলে এই যুগকে বিশেষ ভাবে জড়-বিজ্ঞানের যুগ কহিতে পারা যায়। আমাদের চক্ষুরাদি যে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, তাহারাই জড়ের সাক্ষ্য দেয়। জড়ের অস্তিত্ব ও গুণাগুণের কথা এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা জানিতে পারি। এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপরই আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই জড়-বিজ্ঞানের দ্বারা আধুনিক যুগের চিন্তা বিশেষ ভাবে অভিভূত হইয়া আছে বলিয়া এই যুগের প্রধান লক্ষণ এই, যে ইহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ-বাদী। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং এই প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত অনুমান ও উপমান, ইহাই এই যুগের চিন্তার বিশেষ আশ্রয় হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য এই যুগ অনেকটা জড়-বাদী। জড়ের প্রামাণ্য সর্ব্ব-জন-প্রত্যক্ষ। জড়ের অস্তিত্ব

বা গুণাগুণ সম্বন্ধে মানুষের ইন্দ্রিয়ই অকাট্য প্রমাণ। এখানে শাস্ত্রের বা গুরুর বা অন্য কোন প্রকারের বাহিরের প্রামাণ্যের আশ্রয়-গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। জীমূতবাহনের কথায় বলিতে পারা যায়, যে শত শাস্ত্র-বচনের দ্বারাও বস্তুর প্রকৃতি নষ্ট হয় না—সহস্র গুরু-বাক্যের দ্বারাও নহে। আর এসকল বস্তু লইয়াই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাড়ে-ষোল আনা কাজ। সুতরাং জীবনের অধিকাংশ কাজেই আমাদিগকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির হাত ধরিয়া চলিতে হয়। এ সকল ব্যাপারে অতীন্দ্রিয়ের পশ্চাতে চলিবার চেষ্টা করিলে, জীবনের অনেক কর্ম্মই পণ্ড হইয়া যায়।

মানুষের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান যখন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অপূর্ণ ছিল, তখন এই বহির্জ্জগতের প্রভাবকে অতিক্রম করিবার জন্য সে নানা প্রকারের তন্ত্র-মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিত। আধুনিক জড়-বিজ্ঞান বাহ্য বস্তুর জ্ঞান প্রচার করিয়া সে সকল তন্ত্র-মন্ত্রের প্রয়োজন নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের সাধনার উপরে অতিপ্রাকৃতের প্রভাবও অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই যুগের আদিতে যুগ-প্রবর্ত্তক চিন্তা-নায়কেরা অনেকেই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কোন কিছুর প্রামাণ্য স্বীকার করিতে চাহেন নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের এই আতিশয্য ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। জড়-বিজ্ঞান নিজেই এ কাজটা করিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা জড়ের গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করি—ইহা সত্য। কিন্তু কেবল খণ্ডভাবে এ সকল গুণাগুণের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়াই জড়-বিজ্ঞান ক্ষান্ত থাকে নাই। জড় সম্বন্ধে আমাদের বিশিষ্ট জ্ঞানগুলিকে আশ্রয় করিয়া জড়-বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন জড়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই এক একটা সাধারণ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিতেছে এবং জড়ের খণ্ড খণ্ড জ্ঞানগুলিকে এই নিয়মের অধীনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে

চেষ্টা করিতেছে। আর যে নিয়মের দ্বারা জড়ের প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয়, সে নিয়মের খোঁজে যাইয়াই এই জড়-বিজ্ঞান স্বল্প-বিস্তর পরিমাণে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অধিকারকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। জড়-বিজ্ঞান যে সকল নিয়মের আবিষ্কার করিতেছে, তাহার কার্য্যমাত্র আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি; কিন্তু যে নিয়মের দ্বারা এই কার্য্য ঘটে, সেই নিয়মকে আমরা রাসায়ণিক তৌলযন্ত্রে চড়াইয়া ওজনও করিতে পারি না। কিম্বা অণুবীক্ষণের নীচে রাখিয়া দেখিতেও পাই না। সে নিয়মের অস্তিত্ব-বোধ জড়ে নাই; কিন্তু মনের ভিতরে আছে। এই ভাবে আধুনিক জড়-বিজ্ঞানই ক্রমে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের আতিশয্যকে কমাইয়া দিতেছে।

আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোচনাতেও ক্রমে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের প্রকৃতিটা পরিষ্কার-রূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইন্দ্রিয় সকল যে অপূর্ণ; কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যে কিছুতেই কোনও বস্তুর সাকল্য ধরিতে পারি না; পরিপূর্ণ রূপে কিছুতেই যে কোনও বস্তু কোনও ইন্দ্রিয়ের নিকটে নিজেকে ধরা দেয় না; ইন্দ্রিয়-সকল যে খণ্ড খণ্ড অনুভূতি প্রদান করে; তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়া ও এক সঙ্গে গাঁথিয়াই যে আমাদের বস্তু-জ্ঞান-লাভ হয় এবং ইন্দ্রিয়ের উপরে আমাদের মধ্যে যে আর একটা শক্তি বা বৃত্তি আছে, যে শক্তি বা বৃত্তি নিয়ত এই ভাবে খণ্ড খণ্ড ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে গাঁথিয়া দিতেছে—এসকল কথা আজকাল সকলেই স্বীকার করিতেছেন। আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় কহিতে গেলে এক সময়ে বর্ত্তমান যুগের চিন্তা ও সাধনা মনোময় কোষ পর্য্যন্তই অধিকার করিতে পারিয়াছিল। এই মনোময় কোষের উপরে তাহার প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা রূপে যে বিজ্ঞানময় কোষ রহিয়াছে, তাহার সন্ধান পায় নাই; আর সন্ধান পায় নাই বলিয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানই যে

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থের লেখক ভক্তিভাজন বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়—তাঁর জীবন-সন্ধ্যায়। তাঁর কাছে অনেক দাবী আমাদের ছিল—তিনি সাগ্রহে, সস্নেহে সে দাবী পূরণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন—কিন্তু কালের নিষ্ঠুর বিধান তাঁকে বেশী দিন আর এ জগতে রাখ্‌লে না। বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা সাহিত্য এক প্রতিভাশালী পুরুষের অনেক মূল্যবান্ অবদান থেকে বঞ্চিত হ'ল।

"যুগের মানুষ বিজয়কৃষ্ণ" তিনি লিখ্‌তে আরম্ভ করেন আমাদেরই অনুরোধ-ক্রমে। গ্রন্থখানি তিনটী খণ্ডে সম্পূর্ণ করা তাঁর অভিপ্রেত ছিল। প্রবর্ত্ত, সাধক ও সিদ্ধ—তাঁর জীবন-গুরুর এই তিন বিভিন্ন অবস্থা নিয়েই এই পূর্ণাঙ্গ জীবন-গ্রন্থ রচনা করার তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর সে সুবৃহৎ পরিকল্পনার মাত্র একটী খণ্ডই তিনি পূর্ণ করে' যেতে পেরেছিলেন।

"প্রবর্ত্তক বিজয়কৃষ্ণ"—এই নামে সেই অমৃতময় জীবন-কাহিনীর প্রথম অংশ আমরা প্রকাশ করলুম।

পুণ্য-শ্লোক মহাগুরুর যোগ্য মন্ত্র-শিষ্য তাঁর আরাধ্য যুগ-দেবতার যেটুকু পুণ্য-কথা লিখে যেতে পেরেছেন সেটুকুও দুর্ল্লভ, অমূল্য, অমৃতময়। ইহার আস্বাদনে বাঙ্গালী স্বজাতীয় একজন অমর যুগ-পুরুষকে নূতন আলোকে চিন্‌বে—শুধু ভক্তের চক্ষে নয়, কর্ম্মী, ভাবুক, সাধকের দৃষ্টি দিয়ে। গোস্বামী মহাশয়ের অনেক জীবন-গ্রন্থ আছে; কিন্তু সকলের মধ্যে এই অসম্পূর্ণ বইখানি লেখকের অসামান্য বৈশিষ্ট্যে অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থকারের অমর আত্মা ঊর্দ্ধধাম থেকে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় জড়জগতের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াই সঙ্গে সঙ্গে একটা অতীন্দ্রিয় জগতেরও অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, এ কথা ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। ক্রমে ইহা ধরা পড়িয়াছে। এই জন্য আমাদের এই বর্ত্তমান যুগ নিতান্ত প্রত্যক্ষ-বাদী হইয়াও নাস্তিক্য-সিদ্ধান্তকে একেবারে বরণ করিয়া লয় নাই। কিন্তু এ যুগের নাস্তিক্যও যেমন, আস্তিক্যও সেইরূপ উপযুক্ত প্রমাণ ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করিতে রাজী নহে।

ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও সাধনা এক সময়ে একটা ঐকান্তিক বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং এই বিরোধের মুখে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অতীন্দ্রিয়ের অধিকার একেবারেই অস্বীকার করিতে গিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে কেবল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের দ্বারা জটিল বিশ্ব-সমস্যার নিঃশেষে মীমাংসা হয় না দেখিয়া, ইন্দ্রিয় এবং অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে কোনও সমন্বয় সম্ভব কি না, ইহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। যত ক্ষণ না এই বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও এই সমন্বয়ের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হইতেছে, তত ক্ষণ বর্ত্তমান যুগের সাধনা কিছুতেই নিজের সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না। এই জন্য যে সকল সাধক বা সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবনে ও সাধনায় এই বিরোধের নিষ্পত্তি ও এই সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাদিগকেই সত্য ভাবে এই যুগের 'যুগের মানুষ' কহিতে পারা যায়। কেন না, তাঁহারাই এই যুগের প্রাণকে অধিকার করিয়াছেন বা করিতেছেন। অপরে কেবল ইহার বাহিরের খোসাটা লইয়াই টানাটানি করিতেছেন মাত্র।
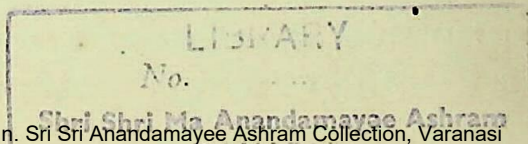
এক দিকে যেমন এই বর্ত্তমান যুগ জড়-বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারার দ্বারা বিশিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ অন্য দিকে ইহাকে বিশেষ ভাবে মানবের চিন্তার স্বাধীনতার যুগও বলা যায়। এই স্বাধীনতার অর্থ এই, যে মানুষ নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া শাস্ত্রের বা গুরুর আদেশে কোনও কিছুতে বিশ্বাস করিবে না। এইজন্য একদিন এই যুগের বিশিষ্ট ধর্ম্ম-চিন্তা ও ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও গুরু বর্জ্জন করিয়া কেবল স্বানুভূতির উপরেই ধর্ম্মের সাধ্য ও সাধনকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। কোথাও কোথাও এখনও এই চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ক্রমে এই স্বানুভূতির অপূর্ণতা এবং অক্ষমতা প্রকাশিত হইয়া কেবল ইহার উপরেই যে ধর্ম্ম-সাধনকে গড়িয়া তোলা যায় না, এই জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকে দেখিতেছে, যে শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে ধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিলে তাহার সার্ব্বজনীনতা রক্ষা পায় না। অন্য দিকে ইহাও দেখিতেছে, যে স্বানুভূতিকে ছাড়িয়া বা চাপিয়া রাখিয়া কেবল শাস্ত্র এবং গুরুকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম-সাধন করিতে গেলে, সে সাধন সত্য এবং আন্তরিক হইতে পারে না। কেবল শাস্ত্রের উপদেশে বা গুরুর আদেশে ধর্ম্মের বাহিরের অনুষ্ঠানগুলিই করা সম্ভব ; কিন্তু সত্যভাবে জ্ঞান বা বিশ্বাসের অনুশীলন সম্ভব হয় না। আমাদের প্রাচীনেরাও ইহা বুঝিয়াছিলেন। এইজন্য যোগবাশিষ্ঠ কহিয়াছেন, যে "সদ্‌গুরু, সুশাস্ত্র এবং স্বানুভূতি, এই তিনের এক-বাক্যতার উপরেই সত্য ধর্ম্ম-বস্তুর প্রতিষ্ঠা হয়।" গুরু, শাস্ত্র ও স্বানুভূতির এই একবাক্যতা নষ্ট হইয়া মধ্য-যুগের ধর্ম্মকে কেবল গুরু-

শাস্ত্র-মুখী করিয়া তুলিয়াছিল। ইহারই ফলে মধ্যযুগের ধর্ম্মে বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের এবং আচার-বিচারের এত বাহুল্য দেখা যায়। অন্য পক্ষে বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম-চিন্তা ও ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত প্রথমে শাস্ত্র ও গুরুকে একেবারেই সরাইয়া দিয়া শুদ্ধ স্বানুভূতির আশ্রয় করিয়া আত্যন্তিক ভাবে অন্তর্ম্মুখীন বা subjective হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার অপরিহার্য্য পরিণাম এই দাঁড়ায়, যে অনেক সময়ে এই স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠ ধর্ম্মে সত্য এবং কল্পনার প্রভেদ এক-রূপ বিলোপ-প্রাপ্ত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরস্পরের বিরোধ-নিষ্পত্তির কোনও উপায় থাকে না। স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠ ধর্ম্মের এই সকল অপূর্ণতা যে পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে, সেই পরিমাণে বর্ত্তমান যুগের সাধনায় শাস্ত্রাদির অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য অস্বীকৃত হইলেও, বিশ্ব-মানবের যুগ-যুগান্ত-ব্যাপী আধ্যাত্মিক জীবন এবং ধর্ম্ম-সাধনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা-রূপে শাস্ত্রের নূতন মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

যেমন শাস্ত্রের, সেইরূপ গুরুরও নূতন মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা হইতেছে। ধর্ম্ম-সাধনে শাস্ত্র এবং গুরু অথবা যোগবাশিষ্ঠের কথায়—"সুশাস্ত্র এবং সদ্‌গুরু" ইহারা একে অন্যের অপেক্ষা রাখেন। শাস্ত্র ত বাক্যমাত্র। বাক্যের অর্থ বাক্যের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাক্য যে বস্তু বা বিষয়কে প্রকাশ করে তাহারই মধ্যে এবং কেবল তাহারই দ্বারা বাক্যের সত্য মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। বাক্য যে বস্তু বা বিষয়ের সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র, সে বস্তু বা বিষয় যে জানে না, সে বাক্যের অর্থও বুঝে না এবং বুঝাইতে পারে না। তাঁহাকেই আমাদের জাতীয় সাধনার কোষে সদ্‌গুরু কহে, যিনি নিজের সাধনের দ্বারা শাস্ত্রবাক্য সে বস্তু বা বিষয় নির্দ্দেশ করে, তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। শাস্ত্র যাঁহার সাধনায় প্রকট হইয়াছে, তিনিই কেবল শাস্ত্রের অর্থ

ব্যক্ত করিতে পারেন। শব্দ-কোষ ছাড়া যেমন সাহিত্য পড়া যায় না, সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে : সেইরূপ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম-বোধ হয় না। বর্ত্তমান যুগের সাধনা একদিন শাস্ত্র-গুরু বর্জ্জন করিয়াই এখন ক্রমে সত্যভাবে ধর্ম্ম-সাধনে শাস্ত্রের ও গুরুর স্থান দিতে আরম্ভ করিয়াছে। শাস্ত্র এবং যুক্তি, স্বানুভূতি এবং গুরুর উপদেশ, এ সকলের মধ্যে মধ্য-যুগে যে বিরোধ জাগিয়াছিল, ক্রমে তাহার নিষ্পত্তির চেষ্টা হইতেছে। এই বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যুগের চিন্তার স্বাধীনতা সম্যক্‌রূপে আপনার সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে না। আর যে সকল সাধক এবং সিদ্ধ মহাপুরুষেরা এই বিরোধের ভিতর দিয়া গিয়া ইহার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও সম্যক্ সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদিগকেই সত্য অর্থে এই যুগের 'যুগের মানুষ' কহিতে পারা যায়। এই বিরোধ যাঁহাদিগকে স্পর্শ করে নাই, সুতরাং যাঁহাদের জীবনে এই সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তাঁহারা যত বড় সাধক বা ভক্ত মহাজন হউন না কেন, তাঁহাদিগের সাধন এবং ভক্তিকে মাথায় তুলিয়াই রাখিতে পারি ; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের যুগ-সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতে পারি না।

৫

চিন্তার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই যুগ মানুষের কর্ম্মকেও স্বাধীন করিতে চাহিয়াছে। জ্ঞানের দিক্ দিয়া এই যুগ যেমন সকল বিষয়ে উপযুক্ত যুক্তি এবং প্রমাণ অন্বেষণ করে এবং যত ক্ষণ না কোনও মতবাদ বা সিদ্ধান্ত উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ততক্ষণ তাহাকে গ্রহণ করে না, সেইরূপ কর্ম্মের দিক্ দিয়া যে কর্ম্মের প্রেরণা

মানুষের প্রাণের ভিতর হইতে না উঠে এবং যাহার আশ্রয়ে তাহার আত্ম-চরিতার্থতা-লাভের কোনও সম্ভাবনা নাই, তাহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া বরণ করিয়া লইতে চাহে না। যে কার্য্যে আমার মন সায় দেয়, সেই কর্ম্মই বিহিত। যে কর্ম্ম অপরের আদেশে করিতে হয়, তাহা বিহিত নহে। আমি যাহা ভাল বুঝি, তাহাই করিব। রাজা বা সমাজ যাহা ভাল বলিয়া আমার উপরে চাপাইতে চাহেন, তাহা করিব না; এবং সেজন্য যদি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর—ইহাই বর্ত্তমান যুগের নীতির বা ethics-এর মূল সূত্র। আমাদের যুগের এই নীতি এই জন্য মানুষের আত্মচরিতার্থতাকে বা Self-realisation-কেই চরম লক্ষ্যরূপে বরণ করিয়াছে। এই আধুনিক আদর্শ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই নব্যনীতির প্রেরণায় আবার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। একদিন এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সর্ব্ব প্রকারের সমাজ-বন্ধনকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা অভিনব অরাজকতার সৃষ্টি করিতে গিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের অনুশীলনের সঙ্গে আগেকার নিরঙ্কুশ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অনেকটা সংযত হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান মানব-সমাজকে একটা জীব-রূপে কল্পনা করিয়াছে। আর কল্পনাই বা বলি কেন? সমষ্টিগত সমাজের মধ্যে সে কতকগুলি সাধারণ জীব-ধর্ম্ম রহিয়াছে, ইহা সমাজ-তত্ত্বের সামান্য আলোচনা করিলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন মানব-সমাজে এক একটা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। এই বৈশিষ্ট্য সেই সকল সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বল্প-বিস্তর পরিস্ফুট হয়। এই বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়াই এ সকল ব্যক্তি নিজেদের জীবনের স্বার্থকতা লাভ করিতে পারেন। সমাজের

জীবন-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, এই বৈশিষ্ট্য লোপ পাইয়া তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু করিয়া তোলে এবং ক্রমে এই ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন মাত্র লোপ প্রাপ্ত হয়। এ সকল প্রত্যক্ষ কথা। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান সমাজ-জীবনের ঘন নিবিষ্টতার জ্ঞান পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কতক পরিমাণে যে তাহার সমাজের সমষ্টিগত জীবনের সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে; গাছের ডাল কাটিলে যেমন তাহা শুকাইয়া যায় সেইরূপ সমাজের সমষ্টি-গত জীবন-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কি পরিমাণে সে ব্যক্তিগত জীবনের শক্তি এবং সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া যায়—এ সকল কথা এখন লোকে বুঝিতেছে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পদ্ অতি ঘনিষ্ট। আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান এই সম্বন্ধকে এক-রূপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধই কহিয়া থাকে। সমাজ অঙ্গী-স্বরূপ। সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এই অঙ্গীধর অঙ্গ-স্বরূপ। অঙ্গীকে ছাড়িয়া অঙ্গ বাঁচে না। আবার অঙ্গকে ছাড়িয়া অঙ্গীও নিজের সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রচার করিয়া আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান ক্রমে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অপূর্ণতা দূর করিতেছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ আপাততঃ কোনও কোনও দিকে চাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, ইহা সত্য। প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের উপরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার লোভে এবং প্রতিবেশী সমাজের আততায়িতা হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য কোনও কোনও আধুনিক সমাজ এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শটাকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু যেখানেই এই চেষ্টা বিশেষ ভাবে হইয়াছে, সেখানেই সাধারণ জন-সঙ্ঘ নিজেদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য সম্মিলিত হইয়া সে চেষ্টাকে বিফল করিয়া দিয়াছে। সমাজের সমষ্টিগত শক্তি ও

অধিকারের সঙ্গে সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বত্ব ও স্বাধীনতার সংগ্রাম এখনও চলিতেছে। ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পরের অধিকারের মধ্যে এ পর্য্যন্ত একটা সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তবে এ চেষ্টা চারিদিকেই হইতেছে। কিন্তু যতক্ষণ না এই সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তত ক্ষণ বর্ত্তমান যুগ নিজের আদর্শকে লাভ করিবে না। এখানেও যে সকল সাধক এবং চিন্তানায়কেরা নিজেদের জীবনের সাধন ও সিদ্ধান্তের দ্বারা এই সমন্বয়ের পথটা প্রশস্ত করিয়া দিতেছেন, তাঁহাদিগকেই সত্য ভাবে এই যুগের 'যুগের-মানুষ' কহিতে পারি।

৬

সর্ব্বোপরি আমাদের এই বর্ত্তমান যুগ মানবতার যুগ। পুরাতন যুগে দেবতার প্রভাব ছিল। দেবতার আওতায় পড়িয়া মানুষ বাড়িতে পারিতেছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে দেবতার শূন্য সিংহাসনে এই যুগের শ্রেষ্ঠতম সাধনা মানুষকেই বসাইতেছে। মানুষের মধ্যেই যে দেবতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন এবং মানুষকে ছাড়িয়া আর কোথাও সে দেবতার সন্ধান পাওয়া যায় না, বর্ত্তমান যুগের চিন্তা ও সাধনা এই সত্যটাকে যেমন দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়াছে, পূর্ব্বতন কোনও যুগের চিন্তা ও সাধনা সেরূপ ধরিতে পারে নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কচিৎ ভাগ্যবান্ সাধক এবং সিদ্ধ মহাপুরুষেরা এই নর-দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আর ইহাও মানিতেই হয়, যে মানুষ যে দিন হইতে দেবতার ভজনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই সে তাহার ইষ্টদেবতার মধ্যে নিজের অন্তরের শ্রেষ্ঠতম

ও পূর্ণতম মনুষ্যত্বের প্রকট মূর্ত্তিকেই অন্বেষণ করিয়াছে; কিন্তু নিজের অক্ষমতা ও অপূর্ণতা অনুভব করিয়া এই মানুষই যে প্রত্যক্ষ দেবতা, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা মুখ ফুটিয়া বলা দূরে থাকুক, মনের ভিতরেও কল্পনা করিতে সাহস পায় নাই এই জন্য সে নিজের ইষ্টদেবতার মধ্যে মানুষকে খুঁজিতে যাইয়াই নানা দিক্ দিয়া সেই দেবতাকে মানুষ হইতে অনেক দূরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে সে দেবতাকে সহস্র-শীর্ষ বলিয়া কল্পনা করিয়াছে; এবং নারায়ণকে পাইয়াও তাঁহাকে দ্বিভুজরূপে ধরিতে পারে নাই, চতুর্ভুজ, ষড়ভূজাদি রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার ভজনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। মানুষ-রূপে দেবতাকে পাইয়া, তাঁহার সঙ্গে বিবিধ রসের সম্বন্ধ পাতাইয়া নিজের মনুষ্য-জীবনকে সার্থক করিবার জন্যই সে অবতার-বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু অবতার গ্রহণ করিয়াও দেবতা দেবত্বের ঐশ্বর্য্য দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া মানুষ হইতে পৃথক্ হইয়া রহিলেন; অবতারকেও মানুষে অতিপ্রাকৃতের আবরণে আবৃত করিয়া রাখিল। যে আশায় সে অবতারের আশ্রয় লইয়াছিল, সে আশা পরিপূর্ণ হইতে পারিল না। বহু যুগ-যুগান্ত পরে এবার মানুষ মানুষের মধ্যেই আপনার দেবতার নাগাল পাইয়াছে। ইউরোপ এজন্য superman-এর কথা কহিতেছে। কিন্তু এখানেও একটা বিরোধ জাগিয়াছে। একদিন যেমন মানুষ মানুষকে ছাড়িয়া দেবতাকে ধরিতে গিয়াছিল, আজ সেইরূপ আবার দেবতাকে ছাড়িয়া এই প্রাকৃত মানুষকেই দেবতার আসনে বসাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন, ইহার সন্ধান পাইয়া, মানুষের বাহিরেও যে দেবতা আছেন, এই কথাটা সে ভুলিয়া যাইতেছে। এই জন্য বর্ত্তমান যুগ এখনও কেবল এই মহা-সত্যের এক পাশে পড়িয়া রহিয়াছে, পরিপূর্ণরূপে ইহাকে অধিকার করিতে পারিতেছে না। যে সকল সাধক

এবং সিদ্ধ মহাপুরুষেরা এই নর-দেবতার তত্ত্বকে নিজেদের সাধনের দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই বর্ত্তমান যুগের এই পবিত্র লালসা পরিতৃপ্ত হইবে। এই জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বোপরি এই যুগের 'যুগের মানুষ' বলিয়া প্রণাম করি।

৭

যে বর্ত্তমান যুগ-ধর্ম্মের এই সকল লক্ষণ, সেই যুগ-ধর্ম্ম বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সাধনে এবং সিদ্ধিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার জীবনে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তারপ্রভাব এক সময়ে খুবই পড়িয়াছিল। যখন তিনি সেই প্রভাবের একদেশদর্শিতা অতিক্রম করিয়া গেলেন, তখনও কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য এই জড়-বিজ্ঞানের মর্য্যাদা এবং অধিকার অস্বীকার করেন নাই। যুক্তি-বাদের এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সত্যকে একদিন তিনি আপনার সর্ব্বস্বপণ করিয়া নিজের ধর্ম্মজীবনে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ক্রমে যখন তিনি এই যুক্তি-বাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের একদেশদর্শিতা অতিক্রম করিলেন, তখনও বিচার এবং স্বাধীনতার পথ বর্জ্জন করেন নাই; এ পথ যে কুপথ, কোনও দিন এমন কথা কহেন নাই। কিন্তু সদ্‌গুরু, সুশাস্ত্র এবং স্বাভিমতের একবাক্যতার উপরেই যেমন নিজের তিনি ধর্ম্মের প্রামাণ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিজের শিষ্যদিগকেও স্বাভিমত পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রকে বা গুরুকে আশ্রয় করিতে উপদেশ দেন নাই। একদিন নরপূজার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; পরে যখন সত্য নর-দেবতার সাক্ষাৎ-কার লাভ করিলেন, তখনও সহজিয়া পথ অবলম্বন করেন নাই। একদিন

তিনি দেববাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনায় আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ কথা সর্ব্বদাই কহিয়াছেন যে, তিনি যে রাধাকৃষ্ণের ভজনা করেন, সে রাধা-কৃষ্ণ দেবতা নহেন। দেবতারাও এই রাধা-কৃষ্ণের লীলা দেখিবার জন্য লালায়িত। এই রাধা-কৃষ্ণ রূপক নহেন। এই রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব-বস্তু। এই রাধা-কৃষ্ণ-লীলা সম্ভোগ করিবার অধিকারী সকলে নহেন। যাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ না হইয়াছে, তাঁহাদের এ অধিকার জন্মে না। একাধিক বার তাঁর মুখে এ কথা শুনিয়াছি। গোঁসাই কি ভাবে সে রাধা-কৃষ্ণের ভজনা করিতেন, একদিন শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পড়িবার সময়ে মনে হয় যেন সে তত্ত্বের সন্ধান পাইলাম।

"ব্রজে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া স্মরণ
নিশিদিন করে রাধাকৃষ্ণের পূজন।"

এই চাবী দিয়াই গোস্বামী প্রভুর কৃষ্ণ-লীলানুশীলনের নিগূঢ় প্রকোষ্ঠ খুলিতে পারা যায়। এইরূপে যে দিক্ দিয়াই তাঁহার জীবন-চরিত্র, সাধন এবং সিদ্ধির আলোচনা করি না কেন, সকল দিকেই ইহার মধ্যে একটা অপূর্ব্ব সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই এই সমন্বয়ের দ্বারাই তিনি আমাদের বর্ত্তমান যুগের সাধনাকে অধিকার করিয়া এ যুগের 'যুগের-মানুষ' হইয়া আছেন।

সাধনের তিন অবস্থা

সাধনের তিন অবস্থা, মহাপুরুষদিগের মুখে এ কথা শুনিয়াছি। প্রথম প্রবর্ত্তক, দ্বিতীয় সাধক, তৃতীয় সিদ্ধির অবস্থা। সকল সাধকই যে সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাও নহে। সকল প্রবর্ত্তকই যে সাধকের অবস্থা লাভ করেন, তাহাও নহে। বহুতর সরল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি

প্রবর্ত্তাবস্থাতেই আমরা তাঁহাদের জীবনের যতটুকু দেখি তার সবটাই কাটাইয়া চলিয়া যান।

"মনুষ্যানাম্ সহস্রেষু কশ্চিৎ যততে সিদ্ধয়ে"—হাজার লোকের মধ্যে ক্বচিৎ একজন সিদ্ধি-লাভের জন্য যত্ন করেন, তাঁহারাই সাধক। বাকী নয় শ' নিরনব্বই জনের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ বা অন্তরে ধর্ম্মের প্রেরণা অনুভব করিয়া সাধ্য বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। ইঁহারাই প্রবর্ত্তক। এ সংসারে প্রবর্ত্তকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, শতেকে জনেক মিলে কি না, সন্দেহ। সাধ্য বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে তাহার সন্ধান পাইলেই প্রকৃত সাধনের আরম্ভ হয়। সহস্র প্রবর্ত্তকের মধ্যে দু' পাঁচজন ভাগ্যবান্ পুরুষ সাধকের অবস্থা পর্য্যন্ত পৌছেন। আর সহস্র সাধকের মধ্যে ক্বচিৎ একজন সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

সাধনের প্রথম সোপান—প্রবর্ত্তাবস্থা। ইচ্ছা করিয়া কেহ এই সোপানে উঠিতে পারে না। যাঁহাদের প্রকৃতির ভিতরেই একটা বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি আছে, তাঁহারাই কেবল এই অবস্থা লাভ করেন। কাহারও প্রকৃতিতে এই আস্তিক্য-বুদ্ধি নিহিত থাকে, কাহারও প্রকৃতিতে বা একেবারেই থাকে না। মানুষে মানুষে এ বৈষম্য কেন হয়, বলা বড় কঠিন।

যাঁহারা জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কর্ম্ম-ফলের উপরে এই বৈষম্যের দায় চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হন। জড়-বিজ্ঞানের সত্য-সমূহ যে প্রকারের প্রামাণ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেরূপ প্রামাণ্যের দ্বারা জন্মান্তর-বাদ বা কর্ম্ম-ফলের বিধানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সুতরাং জন্মান্তর-বাদ বা কর্ম্ম-ফলের বিধান আমাদিগকে মানিতে হইলে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হয়, ইহার আর উপায়ান্তর নাই। এই মতবাদ স্বীকার করিলে জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসার একটা সোজা

পথ পাওয়া যায়। এ অনুমান যে নিতান্ত অসঙ্গত বা অযৌক্তিক, এমনও বলিতে পারি না। অনুমান মাত্রেই প্রত্যক্ষের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠে। জন্মান্তর বা কর্ম্মফল-বাদের অনুমানও কতকগুলি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠে। মানুষে মানুষে যে প্রকৃতিগত একটা বৈষম্য আছে, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। একই মাতা-পিতার সন্তানদিগের মধ্যেও এ বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোন বৈজিক প্রভাবেই যে এই বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, সহসা এই সিদ্ধান্ত করা সহজ হয় না। বৈজিক তত্ত্বের অন্তরালেও একটা দুর্ভেদ্য সমস্যা লুকাইয়া থাকে। সেই সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্যই কেহ কেহ এই জন্মান্তরের ও কর্ম্মফলের মতবাদের আশ্রয় লইয়া থাকেন।

ইহারা বলেন, যে লক্ষ লোকের মধ্যে যে ক্বচিৎ দু'পাঁচজন মাত্র প্রবর্ত্তক দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের সাধনার ফল। সাধনের প্রথম অবস্থা যেমন প্রবর্ত্তকের অবস্থা, সেইরূপ এই প্রবর্ত্তাবস্থারও পূর্ব্বে একটা অবস্থা আছে। সে অবস্থায় কেবল জ্ঞান-লিপ্সা মাত্র বিদ্যমান থাকে। সে অবস্থায় জীব সংসার-সমস্যার সম্মুখীন হইয়া এই সমস্যার অর্থ টা কি, ইহা সে জানিতে চাহে। অনেক সময়ে গোঁজামিল দিয়া একটা মন-গড়া মীমাংসাও সে করিয়া লয়। কিছুদিন ইহাতেই সে তৃপ্তিলাভ করে। এইখানে আসিয়াই অনেকের ধর্ম্মজীবনের অভিব্যক্তি আপাততঃ বন্ধ হইয়া যায়। বহু দিন পরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া হয়ত বা ইহাদের ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা আবার জাগিয়া উঠে। আবার একটা গোঁজা-মিল দিয়া সে এ নূতন সমস্যার মীমাংসা করিয়া লয় এবং কিছু দিন এই মীমাংসাতেই তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু যতক্ষণ না সত্যের বা তত্ত্বের সাক্ষাৎকার-লাভ হয়, ততক্ষণ এই সমস্যার নিঃশেষ মীমাংসা হয় না; ততক্ষণ জীব

অনুমান ও কল্পনার হাত ধরিয়া সত্যের খোঁজে যাইয়া বারম্বার ভ্রান্তি বা সত্যাভাসকেই আঁকড়াইয়া ধরে। এই ভ্রান্তি-পরম্পরার আশ্রয়েই তাহার প্রকৃতির ভিতরে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা বলবতী হইয়া উঠে। একটার পর একটা এইরূপে ধাপে ধাপে সে যত নিজের মন-গড়া সিদ্ধান্তের দ্বারা সকল সমস্যার নিঃশেষ মীমাংসা হয় না বলিয়া তাহাকে বর্জ্জন করিয়া চলিয়া যায়, ততই তাহার অন্তরে সত্য লাভের পিপাসা উত্তরোত্তর বলবতী হইয়া উঠে। যখন এই পিপাসা এত প্রবল হয়, যে ইহার নিবৃত্তি না হইলে জীবন ভারবহ হইয়া উঠে, তখনই প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রবর্ত্তাবস্থা আরম্ভ হয়।

এ সংসারে কোনও না কোন প্রকারের ধর্ম্মাচরণ করেন বহুলোকে। লোক-চক্ষে ইহারা ধার্ম্মিক বলিয়াও পরিচিত হন। ইহাদের বিশ্বাস অটল হইতে পারে, ইহাদের আচার নিষ্ঠা অটুট থাকিতে পারে। ইহাদের দেবতার ভক্তি পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও ইহা-দিগকে সাধক বলা দূরের কথা, প্রবর্ত্তকও বলা যায় না। এই সহজ সরল বিশ্বাস যখন সন্দেহের আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে, তখনই প্রকৃতপক্ষে ইহাদের সত্য ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হয়। এতদাবস্থায় ইহারা কলের পুতুলের মত নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন কলের পুতুল যেমন বাহিরে নড়ে চড়ে, ভিতরে প্রাণ নাই, ইহাদের ধর্ম্মজীবনও সেইরূপ ছিল। জ্ঞানের ভূমিতে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। জ্ঞানের উৎপত্তি হয় বিচারে। বিচারের জন্ম হয় সন্দেহে। এই সন্দেহই প্রবর্ত্তাবস্থার পূর্ব্ব-সূচনা। এই সন্দেহ যাঁহাদের জাগে নাই, তাঁহারা প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না, সাধক হওয়া ত দূরের কথা।

প্রবর্ত্তকের প্রধান লক্ষণ—সাধ্য বস্তুর অন্বেষণ। রস-শাস্ত্রের ভাবায় ইহাকে পূর্ব্ব-রাগের অবস্থা কহিতে পারা যায়। নায়ক-নায়িকার প্রথম

মিলনের পূর্ব্বে যে অনুরাগের অবস্থা হয়, তাহারই নাম পূর্ব্ব-রাগ। গুণ শুনিয়া দূর হইতে কিম্বা চিত্রপটে রূপ দেখিয়া, কিম্বা কোনও প্রকারের ললিত-চেষ্টার আভাস পাইয়া এই পূর্ব্ব-রাগের সঞ্চার হইয়া থাকে। সেইরূপ সাধ্য বস্তু সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়া কিম্বা অন্তরে সে বস্তুর আকর্ষণ অনুভব করিয়া, অথবা তাহার আলোচনা ও অনুশীলনে প্রাণের মধ্যে অনুপম শান্তি ও অপরিসীম আনন্দ লাভ করিয়া, তাহার প্রতি চিত্তের যে আকর্ষণ জন্মে, সেই আকর্ষণই প্রবর্ত্তকের জীবনের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠে। এই লোভে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলে। কোথা যাই, কি করি, কি করিয়া ইষ্ট-দেবতাকে প্রাপ্ত হই; যাঁহার নাম শুনিয়া, গুণ শুনিয়া, প্রাণের মধ্যে যাঁহার আভাস মাত্র পাইয়া, এত আনন্দ ও অমৃতের আস্বাদ করিলাম, কি করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার সঙ্গ পাইব; কি করিয়া তাঁহার মধ্যে নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া দিব—এই ভাবনায় প্রবর্ত্তককে পাগলপারা করিয়া তুলে। তখন তিনি দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া আপনার ইষ্ট-দেবতার সাক্ষাৎকার-লাভের জন্য চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ান। ইহাই প্রবর্ত্তকের চরম অবস্থা।

এই ব্যাকুলতার মধ্যে যদি কাহারও ভাগ্যে সদ্‌গুরু-লাভ হয়, তাহা হইলেই শ্রীগুরুর নিকটে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সত্য সাধন আরম্ভ হয়। তিনি এত দিন যে সাধনা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা বিফলে যায় নাই। সেই সাধনের দ্বারা তাঁহার ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে এবং তাঁহার অন্তরের ভূমি সদ্‌গুরুর বীজ-গ্রহণের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। এই পুণ্যভূমিতে গুরুদত্ত সাধন-বীজ পড়িবামাত্রই অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করে। ইহাই সাধক অবস্থা। এই অবস্থার আদিতে সাধ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ-লাভ হয়; কিন্তু তাহা গুরুশক্তির প্রভাবে,

নিজের সাধনের ফলে নহে। এই সাক্ষাৎকার ক্ষণিক বিদ্যুৎচমকের মত। গয়ার বিষ্ণু-পাদপদ্মে মহাপ্রভু এইরূপেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। এই দেখার উদ্দেশ্য—লোভ বাড়ান। লোভ বাড়াইবার প্রয়োজন, সাধনে রতি জন্মান। এই চকিতে দেখার পরেই আবার অন্ধকার। প্রবর্ত্তাবস্থার অন্ধকারে মাঝে মাঝে কল্পনার বাতি জ্বালাইয়া চলা সম্ভব ছিল। কিন্তু একবার বস্তুর প্রত্যক্ষ লাভ করিলে, কল্পনাতে আর সাধ মিটে না; কল্পনার হাত ধরিতে অন্তরের আত্মগ্লানির উদয় হয়। তখন যাহাকে একবার দেখা গিয়াছে, তাহাকে আবার দেখিবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে। এই যন্ত্রণায় সাধক তখন যে সদ্‌-গুরুর কৃপায় ক্ষণিকের জন্য বস্তুর সাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন, সেই বস্তু-লাভের জন্য সেই সদ্‌গুরুর চরণে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেন, এবং তাঁহার উপদিষ্ট সাধনাকে প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরেন। এ সকলই সাধকাবস্থার প্রধান লক্ষণ।

তারপর, সাধনের তৃতীয় বা চরম অবস্থা। এই অবস্থায় সাধক গুরুশক্তি-সঞ্চারে তত্ত্বের যে চকিত প্রকাশ দেখিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অন্তরে স্থায়ী ভাবে সেই বস্তু লাভ করেন। ইহাই সিদ্ধির অবস্থা।

ভক্তি-সাধনে এই সিদ্ধির অবস্থাতেই সাধকের জীবনে বিবিধ রস-লীলার প্রকাশ হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনে সাধনের এই তিনটী অবস্থাই অতি পরিস্কার-রূপে প্রকট হইয়া-ছিল। এই অবস্থা-ত্রয়ের মধ্য দিয়াই তাঁহার জীবন পরিপূর্ণ-রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যদি কৃপা করিয়া বলান, তাহা হইলে এই তিন অধ্যায়েই তাঁহার চরিতকথা লিখিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে বাসনা করি। প্রথম অধ্যায়—প্রবর্ত্তক বিজয়কৃষ্ণ, দ্বিতীয় অধ্যায়—সাধক বিজয়কৃষ্ণ;

তৃতীয় এবং শেষ অধ্যায়—বিজয়কৃষ্ণের সিদ্ধি আর কি প্রবর্ত্তক-রূপে কি সাধক-রূপে আর কি সিদ্ধ মহাপুরুষ-রূপে—এই তিন রূপেই গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে আমরা যে যুগে জন্মিয়াছি, সেই যুগের নিগূঢ়তম আদর্শের এবং শ্রেষ্ঠতম সাধনার যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, ইহাও দেখিতে পাইব। এই তিন অবস্থাতেই গোস্বামী মহাশয় আমাদিগের যুগের 'যুগের মানুষ' ছিলেন।

জীবজন্ম-তত্ত্ব

ইংরাজদের দেশে মানুষের জন্মটাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া অনেকে মনে করে। এই জন্য তাহাদের ভাষায় 'accident of birth' বলিয়া একটা কথার চল্‌তি আছে। 'Accident' মানে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা না ঘটিলেও পারিত। যেখানে কোনও ঘটনার মূলে আমরা প্রত্যক্ষ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি না, তাহাকেই সচরাচর 'accident' কহিয়া থাকি। যাহা আমাদের ইচ্ছায় ঘটে না, তাহাই 'accident' এই বিশ্ব-ব্যাপারের কোথাও যদি এইরূপ 'accident' অর্থাৎ আকস্মিক ঘটনা-সম্পাতের সূচাগ্র পরিমাণ অবসরও থাকে, তাহা হইলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে একটা নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা রহিয়াছে, এ কথা আর বলা চলে না। শৃঙ্খলার অর্থই পৌর্ব্বাপর্য্য, পূর্ব্ব ও পরের সম্বন্ধে স্পষ্ট না করিয়া কোন আকস্মিক ঘটনা—'accident' ঘটিতেই পারে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা বিশাল বিশ্বকে একটা শৃঙ্খলার জালে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বাঁধিয়াছে। বিজ্ঞান কহে, বিশ্ব একটা 'congeries of relations মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সম্বন্ধের সমষ্টিই এই বিশ্ব। আকস্মিক ঘটনা যদি ঘটিতে পারে, তাহা হইলে এই বিশাল বিশ্বের সম্বন্ধ-জাল ছিঁড়িয়া যায়। সুতরাং

বৈজ্ঞানিক চিন্তাতে 'accident' বা আকস্মিক ঘটনা-সম্পাতের স্থান হয় না।

তত্ত্ব-জ্ঞান কহে, এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের অনাদ্যনন্ত জ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত। অদ্বয় জ্ঞান-বস্তুই তত্ত্ব-বস্তু। যাহা দ্বারা নিখিল বিশ্ব-সমস্যার নিঃশেষ মীমাংসা হয়, তাহাকেই তত্ত্ব-বস্তু কহে। এই অদ্বয় জ্ঞানই ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র সম্বন্ধে সকলকে গাঁথিয়া ধারণ করিয়া আছে—'সূত্রে মণিগণাইব' হারের মণিসমূহ একটা সূতার মধ্যে গাঁথা থাকে, সেইরূপ এই অদ্বয় জ্ঞান-সূত্রে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনা বাঁধা রহিয়াছে। এই অদ্বয় জ্ঞান-বস্তুকে নষ্ট না করিয়া ইহার মধ্যে 'accident' বা আকস্মিক ঘটনা-সম্পাতের স্থান করা সম্ভব হয় না। 'accident''র স্থান করিতে গেলেই এই জ্ঞানের অখণ্ডত্ব বা অচিন্তত্ব নষ্ট হইয়া যায়। যেমন বৈজ্ঞানিক চিন্তাতে, সেইরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের সিদ্ধান্তেও 'accident' বা আকস্মিক ঘটনা-সম্পাতের স্থল হয় না। তবে যে আমরা 'accident' যদি ব্যবহার করি, তাহা কেবল আমাদের অজ্ঞতা বা অজ্ঞানকে ঢাকিবার জন্য। যে কার্য্যের কারণ আমরা ধরিতে পারি না, তাহাকেই 'accident' কহি। ফলতঃ, এই বিশ্বে আকস্মিক ঘটনা বলিয়া কিছু নাই; কিছু হইতেই পারে না। জন্মটাকে তবে কোন সাহসে একটা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া কল্পনা করিব ?

তারপর, আমাদের তত্ত্ব-জ্ঞানে কহে, যে মনুষ্যের আত্মার জন্ম হয় না।

অজো নিত্য শাশ্বতোহয়ং পুরাণ
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

এই আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাতন; শরীর নষ্ট হইলে এই আত্মা নষ্ট হয় না। শরীরটা আত্মার যন্ত্র মাত্র। আত্মা নিজ

প্রয়োজনে এই প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী দেহ ধারণ করে। আত্মার দেহ-ধারণের নামাই জন্ম। প্রয়োজনের অনুরোধে যে কর্ম্ম হয়, তাহা আকস্মিক হইতে পারে না। এই প্রয়োজনই এই কর্ম্মের নিয়ন্তা হইয়া থাকে। সুতরাং জীবের জন্মটা অর্থাৎ তাহার দেহ-ধারণ একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। জীব অজ অর্থাৎ তাহার জন্ম নাই। জন্মের অর্থই কাল বিশেষে উৎপত্তি। জন্মের পূর্ব্বেও জীব ছিল; আর এই জন্যই সংসার-লীলার অবসানেও জীব থাকে। এই ভাবেই আমাদের প্রাচীন তত্ত্ব-জ্ঞান জন্ম-মরণের সমস্যাটার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মাতৃগর্ভে তাহার পঞ্চভৌতিক দেহের বীজ সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বেও জীব ছিল; আর শ্মশানের অগ্নিদহে তাহার ভৌতিক দেহ ভস্মসাৎ হইবার পরেও সে থাকে। এই অধ্যাত্মতত্ত্বের ভিতর দিয়া জীবের জন্মমরণ সমস্যার মীমাংসা করিতে গেলে, তাহার জন্মটাকে কিছুতেই একটা আকস্মিক ঘটনাসম্পাত বলিয়া কল্পনা করা সম্ভব হয় না। আধুনিক জীববিজ্ঞান কহে সে জীব তাহার চারিদিকের বিবিধ বস্তুর সম্বন্ধের মধ্যে সেগুলি তাহার জীবনধারণের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল তাহাই যাচাই করিয়া লয়, যাহা প্রতিকূল তাহা বর্জ্জন করিয়া চলে। মাতৃগর্ভে সঞ্চার হইয়া অবধি জীবকোষাণু সকল এই বাছুনিকার্য্যে লাগিয়া যায়। ইহার ভিতর দিয়াই সে আমরণব্যাপী জীবনসংগ্রামের সরঞ্জামগুলি দিন দিন সংগ্রহ করিয়া লয়। ইহাই জীবনের মূল সঙ্কেত।

প্রশ্ন উঠে মাতৃগর্ভে সঞ্চারের পূর্ব্বেও এই নির্ব্বাচনের নিয়ম আছে, কি নাই?

যদি না থাকে তাহা হইলে পিতামাতার যৌবন সম্বন্ধ হইতেই জীবের কেবল দেহ ধারণ নহে, কিন্তু তাহার আদি সৃষ্টি পর্য্যন্ত মানিয়া

লইতে হয়। ইহা মানিতে গেলে, জীব যে অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ, এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা আর থাকে না। ইহা না মানিলে জীবের জন্মটাকে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার ভিতরে আনিতে হয়; অর্থাৎ মাতৃগর্ভে সঞ্চারের পরে জীব যেমন আপনার জীবনের অনুকূল ব্যবস্থাগুলি বাছিয়া লয়, সেইরূপ মাতৃগর্ভে সঞ্চারের পূর্ব্বেও নিজের প্রয়োজন মত পিতামাতাকে পর্য্যন্ত বাছিয়া লইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্তেই পৌছিতে হয়। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিলে, কেবল মরণের পরেই যে আত্মা থাকে, তাহা নহে; এই সংসার-লীলাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেও আত্মা ছিল, ইহাও মানিতে হয়। জন্মটা যদি সত্য হয়, মরণটাও সত্য নিশ্চয়। জন্ম অর্থ কাল বিশেষে উৎপত্তি। কাল বিশেষে যাহা উৎপন্ন হয়, কালে সে বিনাশও প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। এই জন্য জন্ম আছে মৃত্যু নাই—আমাদের সনাতন অধ্যাত্মবিদ্যা কোনও দিন এমন অদ্ভুত কথায় বিশ্বাস করে নাই। সুতরাং জন্মের পূর্ব্ব হইতেই এই অজ, নিত্য আত্মা আপনার কর্ম্ম-প্রয়োজনে নিজের পিতামাতাকেও বাছিয়া লয়, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। ফলতঃ জন্মান্তরবাদের অন্তরালে এই সিদ্ধান্তটা লুকাইয়া আছে।

৮

গোস্বামী মহাশয়ের বংশ পরিচয়

শান্তিপুরের অদ্বৈত-বংশে পূজ্যপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। "জন্মগ্রহণ" কথাটা আমাদের ভাষাতেই প্রচলিত। ইহা আমাদের ভাষার ইডিয়ম (Idiom)। ইরাজীতে জন্মগ্রহণ এই কথা নাই। ইংরাজী ইডিয়ম—was born—জন্মিয়াছিলেন। ভাববাচ্যে জন্মব্যাপারটাকে ব্যক্ত করে। জন্মগ্রহণ কর্তৃবাচ্য। ইহার

দ্বারা নিজের জন্মব্যাপারে আত্মার যে কর্ত্তৃত্ব আছে, এই কথাটা বোঝায়। গোস্বামী মহাশয় যে অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা হইতেই পারে না। "গ্রহণ" শব্দের দ্বারাই সে ভাব ব্যাহত হয়। তাঁহার জীবনের সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যের বংশ-ধারার একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। নিজের জীবনের প্রয়োজন সাধনের জন্য তিনি এই বংশধারাকে আশ্রয় করিয়া ভূমিষ্ঠ হন। জন্মকালে একথা বলিতে পারিতাম না; কেহই বলিতে পারিত না। তখনও তাঁহার জীবনের প্রয়োজন প্রকাশিত হয় নাই। সেই প্রয়োজন ক্রমে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সমগ্র সংসার-লীলার আলোচনা করিয়া আজ আমরা তাঁহার জীবনের মুখ্য প্রয়োজনটী যে কি ছিল, কোন্ কর্ম্ম সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করেন, ইহা পরিষ্কাররূপে ধরিতে পারিয়াছি। আর সেই প্রয়োজন সাধনের জন্য শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধারাকে অবলম্বন করা যে আবশ্যক হয়, ইহাও অনুমান করিতে পারিতেছি। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে অনর্পিতচরী ভক্তিধারা প্রকট করেন, সেই ভক্তি-ধারার গঙ্গোত্রীরূপে আমরা শ্রীশ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে দেখিতে পাই। অদ্বৈতাচার্য্য যে ভক্তি সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন, তাহা "জ্ঞান-মিশ্র-ভক্তি" ছিল। মহাপ্রভু স্বয়ং যে ভক্তি সাধন করেন, তাহা "জ্ঞানশূন্যা ভক্তি" ছিল। তাঁহার "দিব্যোন্মাদের" ভিতর দিয়া এই "জ্ঞানশূন্যা ভক্তির" চরম প্রকাশ হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রভুর ভক্তিতে এই দিব্যোন্মাদের প্রকাশ হয় নাই। তাহার ভক্তি "জ্ঞানমিশ্রা" ছিল বলিয়াই আমাদের বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে লোকে অদ্বৈতপ্রভুর ভক্তিকে যে পরিমাণ শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিতে পারিবে, মহাপ্রভুর "জ্ঞানশূন্যা" অহৈতুকী ভক্তিতে সে পরিমাণ শ্রদ্ধাবান হইতে পারিবে না। এই জন্যই যিনি মহাপ্রভুপ্রকটিত অনর্পিতচরী ভক্তিধারাকে আবার জাগাইয়া তুলিবেন,

তাঁহার পক্ষে অদ্বৈতপ্রভুর সাধনধারার সঙ্গে সংযুক্ত থাকা প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনেই অদ্বৈত বংশে পূজ্যপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জন্ম হয়, এরূপই মনে হয়।

শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশ অনেক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চারি পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যে অদ্বৈতপ্রভুর অলোকসামান্য সাধন-সম্পদ তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরদিগের কুলধারাকে আশ্রয় করিয়া চলিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। কুলমিশ্রণ ও রক্তমিশ্রণ নিবন্ধন সে ধারা মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই শুকাইয়া ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই চারি পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে এই অদ্বৈত বংশে যে জন্মিয়াছে, সেই যে আচার্য্য প্রভুর সাধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, এমন বলা যায় না। কিন্তু গোস্বামী মহাশয়ের পিতা আনন্দকিশোর গোস্বামীর মধ্যে সেই ভক্তিধারা যেন আবার কিয়ৎ পরিমাণে খুলিয়া গিয়াছিল। আনন্দকিশোর গোস্বামীর চরিতকাহিনী পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে অদ্বৈতপ্রভুর কথা মনে পড়িয়া যায়। অদ্বৈতাচার্য্য মহাভাগবত ছিলেন। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে তাঁহার অনন্যসাধারণ অধিকার ছিল। ভাগবত পাঠ করিতে করিতে তাঁহার ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং তাঁহার দেহে স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিকী বিকারের লক্ষণ প্রকাশিত হইত। শোনা যায়, পূজ্যপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পিতাও ভাগবত-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পড়িবার সময় তিনি তাহাতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন ; ক্ষণে ক্ষণে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুপাত হইয়া পুস্তকের পাতা ভিজিয়া যাইত, আর মাঝে মাঝে 'রাধা কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া এমন হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন যে, তাহাতে দূরস্থ লোক পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিত। অদ্বৈতপ্রভু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। আনন্দকিশোর গোস্বামী

মহাশয়েরও অসাধারণ নিষ্ঠার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সত্য নিষ্ঠা-বস্তু মুমুক্ষুত্বের একটা অতি প্রধান লক্ষণ। মুক্তির জন্য যারা পাগল হইয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যেই এই নিষ্ঠা বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার যেরূপ বিশ্বাস, তাহার নিষ্ঠা সেইরূপ হইয়া থাকে। প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্মে আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের অটল বিশ্বাস ছিল। প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্মে বিগ্রহ-পূজার ব্যবস্থা আছে। আনন্দ-কিশোর গোস্বামীর গৃহে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আনন্দকিশোর গোস্বামী যথাসাধ্য নিজের হাতে শ্যাম-সুন্দরের অর্চ্চনা ও পূজাদি করিতেন, এবং এই বিগ্রহ-সেবাতে তিনি এতটা শুচিতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন যে, যে কাঠ দিয়া শ্যাম-সুন্দরের ভোগ রাঁধা হইত, তাহার প্রত্যেকখানি তিনি পৃথক পৃথক করিয়া গঙ্গাজলে ধুইয়া শুকাইয়া লইতেন। এই জন্য শান্তিপুরের লোকে তাহাকে "লকড়ি-ধোয়া" গোঁসাই বলিয়া ডাকিত। শোনা যায়, একবার তিনি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদর্শনে যাইবার সময় শান্তি-পুরের বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়া সমস্ত পথটা ভূমিষ্ট হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে মাপিয়া গিয়াছিলেন। পথের ধূলা ও কাঁকরের ঘর্ষণ লাগিয়া তাঁর বুকে ঘা হইয়া গিয়াছিল। তথাপি এই মুমুক্ষু বৈষ্ণব এই দুঃসহ অধ্যবসায় পরিত্যাগ করেন নাই। সঙ্গে তাঁহার এক পিতৃস্বসা ছিলেন। তাঁহার বুকে ঘা হইলে পরে তিনি তাহাতে কাঁথা বাঁধিয়া দেন। এইভাবেই আনন্দকিশোর ক্রমে জগন্নাথের মন্দিরের দ্বারদেশে যাইয়া উপস্থিত হন। অদ্বৈতাচার্য্যের মতন আনন্দকিশোর গোস্বামীর ভক্তি বৈধী-ভক্তি ছিল। অদ্বৈতাচার্য্যের মতন আনন্দকিশোর গোস্বামীও পৌরাণিকী কিম্বদন্তী ও দেববাদে বিশ্বাস করিতেন, এবং এ সকলের

আশ্রয়েই ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহার মত ও বিশ্বাস সম-সাময়িক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মত ও বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী ছিল। এ সকল বিষয়ে সাধারণ বৈষ্ণবগণের সঙ্গে তাঁহার কোনই পার্থক্য ছিল না। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণতা, তাঁহার অসাধারণ আচারনিষ্ঠা, সর্ব্বোপরি তাঁহার মুমুক্ষুত্ব এবং মুক্তিকামনায় অসাধারণ কায়িক-ক্লেশ সহিষ্ণুতা—এ সকলের দ্বারা তিনি সে কালের বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকল বিচার করিয়া যে বৈজিক শক্তির আশ্রয়ে বিজয়কৃষ্ণের জন্ম হয়, তাহা যে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সাধনের এবং সিদ্ধির অত্যন্ত উপযোগী ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আর এ সকল তলাইয়া দেখিলে কিছুতেই বিজয়কৃষ্ণের জন্ম ব্যাপারকে একটা accident বা আকস্মিক ঘটনা-সম্পাতমাত্র বলিতে পারা যায় না।

পিতা আনন্দকিশোর গোস্বামীর মত বিজয়কৃষ্ণের মাতা স্বর্ণময়ী দেবীরও কতকগুলি বিশিষ্ট গুণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্কুবাবু লিখিয়াছেন, "দয়া, ঈশ্বর-ভক্তি এবং উদারতাতে এই নারী আবাল-বৃদ্ধ সকলের ভক্তি ও ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন। জাতি নির্ব্বিশেষে দীন দুঃখীর অভাবমোচনে তাঁহাকে সর্ব্বদা ব্যগ্র হইতে দেখা যাইত। তাঁহার হৃদয় আকাশের ন্যায় প্রশস্ত ছিল; তিনি আত্মার বিচার-বিরহিত হইয়া সকলকে ভালবাসিতেন।

"কোন সময়ে তাঁহার গৃহে একটী পরিচারিকার পুত্র প্রতিপালিত হইত; তিনি নিজ পুত্রদিগের সঙ্গে তাহার কোনরূপ প্রভেদ করিতেন না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ একদিন মায়ের ভালবাসার কথা এইরূপ বলিয়া-ছিলেন,—'তিনি দাসীপুত্রকে আমাদের সঙ্গে তুল্যরূপ ভালবাসিতেন। একখানা থালা, একটী ঘটী, একটী গেলাস, একখানা পিঁড়ে তাহাকেও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অপরের কথায় তিনি কর্ণপাত

করিতেন না, বরং দাসীপুত্র বলিয়া কেহ অবজ্ঞা করিলে বেদনা অনুভব করিতেন। কৃপণদিগের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি দুঃখের সহিত বলিতেন, 'আহা', ইহারা বড় কৃপার পাত্র, ইহারা নিজের মহাপ্রাণীকে সর্ব্বদা বঞ্চিত করে'। এজন্য তিনি কৃপণদিগকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন।

"অপরকে খাওয়াইতে তাঁহার এত সুখ হইত যে, প্রতিদিন অন্ততঃ চারি পাঁচ জন লোককে না খাওয়াইলে তৃপ্তিবোধ করিতেন না। তিনি বিধবাবস্থায় বহুদিন সংসারে ছিলেন। এজন্য অনেক সময় স্ব-পাকে একাকিনী আহার করিতেন; কিন্তু বলিতেন, যে কেবল আপনার জন্য রান্না করে, সে শেয়াল-কুকুরের মত; পাঁচজনের কম কিছুইতে রান্না করা উচিত নয়। এজন্য পাঁচ ছয়জন লোকের উপযোগী দ্রব্যাদি রন্ধন করিয়া লোকদিগকে ডাকিয়া খাওয়াইতেন।

"তাঁহার হৃদয় এরূপ কারুণ্যপূর্ণ ছিল যে, লোকের দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার তাঁহার গৃহে শান্তিপুরে এক কাষ্ঠ-বিক্রেতার সঙ্গে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের কাঠের দর লইয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল, কাঠওয়ালা একদর এবং গোস্বামী মহাশয় অন্য দর বলিতেছিলেন। কাঠওয়ালা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, আপনি মাতা ঠাকুরাণীকে ডাকুন। ইতিমধ্যে মাতা তথায় আসিয়া সমস্ত অবগত হইলেন এবং বলিলেন, 'গরীব লোকের দুই চারি আনা মারিয়া তুই কি বড় লোক হবি? উহাদের সহিত গোল করিস্ না, উহারা যা চায় তাই দে। উহারা গরীব লোক, উহাদিগকে কিছু দিতেই হয়, নতুবা উহাদের স্ত্রী-পুত্র কি খাইয়া বাঁচিবে?'

"এই দয়াবতী নারী অনেক সময় শান্তিপুরের বাজারে যে সমস্ত দুঃখিনী বিধবা শাকসব্‌জী বিক্রয় করিতে আসিত, এবং তাঁহারই

গৃহের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইত, তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। তাহাদের শুষ্ক মুখ দেখিয়া তাঁহার কোমল প্রাণে বড় আঘাত লাগিত। তিনি তাহাদিগকে না খাওয়াইয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি এরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন যে, কাহারও দুঃখ দেখিলে নিজের অভাব ভুলিয়া গিয়া শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দান করিতেন।

"টাকা পয়সার হিসাবে তিনি আপনার পর হিসাব করিতে পারিতেন না। একবার শেষ বয়সে যখন ঢাকায় যাইতেছিলেন তখন একজন ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু এই ভদ্র-লোকের পাথেয় ছিল না। তিনি নিজের গাঁটুরী বিক্রয় করিয়া তাঁহার পাথেয়র সংস্থান করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

"তাঁহার সন্তান-বাৎসল্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। অকপট বাৎসল্যে মানুষের মন কিরূপ নির্ম্মল হয় এই নারীর জীবন তাহার দৃষ্টান্ত। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার জননীর কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন, 'আমি বিদেশে যদি কোন আঘাত পাইতাম, রোগযন্ত্রণায় কাতর হইতাম, অথবা কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িয়া মাকে ডাকিতাম, বাটী আসিবা মাত্র মাতাঠাকুরাণী এক এক দিনের ঘটনা আশ্চর্য্যরূপে উল্লেখ করিতেন। গয়ার পাহাড়ে একদিন পাথরে পা ঠেকিয়া আমার এরূপ আঘাত লাগিয়াছিল যে 'মাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলাম। পরে বাটী আসিলে মা বলিলেন, 'তুই কি একদিন আঘাত পেয়েছিলি? পায়ে পাথর ঠেকলে যেমন আঘাত লাগে, হঠাৎ একদিন আমার তেমনি হ'ল। আমি ভাবিলাম ঘরে বসে আছি, পাথর কোথায়? তখন তোর ডাক আমার কাণে বাজিল। মনে হ'ল তুই কষ্ট পেয়েছিস।' তিনি এরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ করিতেন।'

বিজয়কৃষ্ণের পিতামাতার চরিত্রে তাঁহার ভবিষ্যৎ ধর্ম্মজীবনের বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পিতার ঔরসে এবং এই মাতার গর্ভেই তিনি তাঁহার কর্ম্মোচিত দেহমনের মূল উপাদানগুলি প্রাপ্ত হন। এ সকল একটু তলাইয়া দেখিলে তাঁহার জন্ম ব্যাপারকে একটা accident বা আকস্মিক ঘটনাসম্পাতের ফল কিছুতেই মনে করিতে পারি না। কেবল শ্রেষ্ঠ সাধক বা সিদ্ধ-মহাপুরুষদিগের জন্ম ব্যাপারই যে একটা accident বা আকস্মিক ঘটনা নয়, আর ইহার মূলেই কেবল একটা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে, সাধারণ লোকের জীবন ব্যাপারে ইহা থাকে না, এমন বলা যায় না। সকলের জীবনের মূলেই এই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ রহিয়াছে। সকল জীবই নিজের জীবনের প্রেরণায় সেই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন সাধনের জন্য আপনার কর্ম্মোচিত দেহলাভের চেষ্টায় উপযোগী বৈজিক ক্ষেত্র ও উপকরণ বাছিয়া লয়। ইহা প্রমাণ করা যায় না বটে, কিন্তু এই কথাটা না মানিলে জীবনের কোনও নিত্য আধ্যাত্মিক অর্থ হয় না।

৯

বিজয়কৃষ্ণের স্বাভাবিকী আস্তিক্য-বুদ্ধি

পিতা-মাতার স্বভাব ও চরিত্রের ফলে বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে আশৈশব একটা প্রকৃতিগত আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা সচরাচর আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা ছাড়াও যে আর একটা অতীন্দ্রিয় রাজ্য আছে, এই নিশ্চয় ধারণাকেই আমাদের শাস্ত্রসাধনায় আস্তিক্য-বুদ্ধি কহিয়াছেন। দেবতায় বিশ্বাস এই স্বাভাবিকী আস্তিক্য-

বুদ্ধির প্রমাণ। বালক বিজয়কৃষ্ণের অদ্ভুত দেবতা-বিশ্বাস ছিল। শৈশব কালে তিনি শ্যামসুন্দরের ঘরে যাইয়া তাঁহাকে খেলার সঙ্গী হইবার জন্য ডাকিতেন। আর শ্যামসুন্দর সে ডাক শোনেন না, নড়েন-চড়েন না দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। কখনও কখনও তাঁহাকে মারিতে পর্য্যন্ত যাইতেন। যে শ্যামসুন্দরের ভোগ-আরতি হয়, সে শ্যামসুন্দর যে মানুষের মতন সচল ও সচেতন নহেন, শিশু বিজয়কৃষ্ণ কিছুতে ইহা ধারণা করিতে পারিতেন না।

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ধর্ম্মজীবনের প্রথম বনিয়াদ। আদিতে এই বিশ্বাস যুক্তির দ্বারা পরিমার্জ্জিত হয় না। কিন্তু অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্ম্ম যখন কল্পনাবর্জ্জিত এবং বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠে, তখনও কোনও না-কোনও আকারে তাহার মধ্যে এই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটা থাকিয়া যায়। প্রাকৃত জগৎ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময়। এই জগতের সাক্ষী আমাদের চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। এই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যে বিষয়-রাজ্যে ভ্রমণ করি, তাহার অতীত যাহা কিছু তাহাই অপ্রাকৃত। ইংরাজীতে ইহাকেই Super-Natural কহে। এই অর্থে আমাদের বিশুদ্ধতম ঈশ্বর-বিশ্বাসও অতিপ্রাকৃতের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যায়। এই ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু নিরাকার চৈতন্যবস্তুকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। আমরা নিজেরা আত্মচৈতন্যসম্পন্ন বলিয়া নিজেদের ভিতরের চৈতন্যবস্তুর ক্রিয়া দ্বারাই অনুমান ও উপমানের সাহায্যে সচরাচর ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। কিন্তু এই ঈশ্বরতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ তত্ত্ব নহে। এই অনুমান-প্রতিষ্ঠ ঈশ্বর-তত্ত্বের উপরে যে ধর্ম্ম গড়িয়া ওঠে, তাহাও একান্তভাবে অপ্রাকৃত সম্পর্কবিবর্জিত নহে। ফলতঃ অপ্রাকৃতকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীতকে ছাড়িয়া দিলে কোনও ধর্ম্মই আর থাকে না।

দেবতায় বিশ্বাস হউক, অথবা আমরা যাহাকে সুসংস্কৃত ঈশ্বরবিশ্বাস বলিয়া থাকি, তাহাই হউক, ধর্ম্মবিশ্বাসমাত্রেই অতিপ্রাকৃতের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠে। এইজন্য যাঁহাদের প্রকৃতির মধ্যে এই বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি আছে, তাঁহাদিগকেই আজন্মসিদ্ধ ধার্ম্মিক কহিতে পারা যায়। গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে বাল্যকাল হইতেই এই প্রকৃতিগত বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

পরলোকে বিশ্বাস এই স্বাভাবিকী আস্তিক্য-বুদ্ধির একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বরং ঈশ্বর-বিশ্বাস লাভ করা সহজ, কিন্তু মানুষের মধ্যে দেহ ছাড়া যে আর একটা আত্মা আছে, আর এই দেহের বিনাশে যে সেই আত্মার বিনাশ হয় না, ইহা বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন। আধুনিক কালে কি য়ুরোপের কি আমাদের নিজেদের দেশের বিদ্বজ্জন সমাজে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ঈশ্বর মানেন কিন্তু পরলোক মানেন না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহার অন্তরালে যে এক বিচিত্র শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, একথা কিছুতেই অবিশ্বাস করা সম্ভব হয় না। বহুলোক এই অনন্ত শক্তিকেই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং এই শক্তিতে চৈতন্যধর্ম্ম আরোপ করিয়া ঈশ্বররূপে ইহার ভজনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ পথে যে ধর্ম্ম গড়িয়া উঠে, তাহা প্রায়ই সতেজ ও সজীব হইয়া উঠিতে পারে না। এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিতরে সর্ব্বদাই একটা "কিন্তু" জাগিয়া রহে। এ পথে সাধক বহু কষ্টেও যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ধর্ম্ম-জীবনের বনিয়াদ, তাহা লাভ করিতে পারে না। ইহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস বালির বাঁধের মতন হইয়া থাকে। মৃত্যুর নির্ম্মম আঘাতে এই বালির বাঁধ ধসিয়া পড়িয়া যায়। যাঁহাদের প্রকৃতির ভিতরেই একটা সহজ আস্তিক্য-বুদ্ধি থাকে, কেবল তাঁহাদের ধর্ম্ম-জীবন ও ধর্ম্ম-চরিত্রই অচ্যুত-

পদ লাভ করে। অতি শৈশবকাল হইতেই বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে স্বাভাবিকী আস্তিক্য-বুদ্ধির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনি একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমার বয়স যখন বার বৎসর সেই সময় আমার বাল্যসঙ্গীর মৃত্যু হয়। ইহার সঙ্গে আমি একত্র খেলা করিতাম। ঐ সময় আমি আমাদের গৃহে একটি মাটির দেলকোয় প্রদীপ রাখিয়া পড়িতাম। সঙ্গীটীর মৃত্যুর পর একদিন ঐ দেলকো দেখিয়া হঠাৎ আমার মনে হইল, এই মাটীর জিনিবটী আছে আর সে নাই, ইহা হইতে পারে না। তারপর আমি যে কাঁঠালতলায় খেলিতাম, সেখানে গিয়াও আমার মনে হইল, কাঁঠাল গাছ আছে আর সে নাই, ইহা হইতে পারে না। সে অবশ্যই আছে।"

এই আস্তিক্য বুদ্ধি তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে নিগূঢ়ভাবে সর্ব্বদাই লুকাইয়াছিল। এই জন্য তিনি শৈশবে অতি সরলভাবে দেবতায় বিশ্বাস করিতেন। এই স্বাভাবিকী আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল বলিয়াই বাল্যাবস্থায় মৃত্যুর করালরূপ দেখিয়াও তিনি তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিজয়কৃষ্ণ জীবনে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মতবাদ একাধিকবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই ভাঙ্গাগড়ার ভিতরে তাঁহার আস্তিক্য-বুদ্ধি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই। যে সকল প্রমাণের উপরে তিনি সময় সময় তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সে সকল প্রমাণ মাঝে মাঝে নড়িয়া চড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে কখনই ঈশ্বরতত্ত্ব এবং পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তিলার্দ্ধ পরিমাণেই বিচলিত হয় নাই। এই স্বাভাবিকী আস্তিক্য-বুদ্ধির সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই তাঁহার সাধনা এবং সিদ্ধি গড়িয়া উঠে।

সংযম ও সত্য-নিষ্ঠা

গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বদাই কহিতেন যে সত্যরক্ষা ও বীর্য্যধারণ, এই তুইটাই সত্য ধর্ম্মজীবনের বনিয়াদ। তাঁহার জীবনের আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, এই বনিয়াদের উপরেই তাঁহার অনন্যসাধারণ সাধনা ও সিদ্ধি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রে একটা অদ্ভূত নির্ভীকতা দেখা গিয়াছিল। ভয়ই মানুষকে মিথ্যা আচরণে প্রবৃত্ত করে। যে কোনও-কিছুতে ভয় পায় না, তাহার পক্ষে মিথ্যা আচরণের প্রলোভন থাকে না। নির্ভীক বিজয়কৃষ্ণ জীবনে কখনও মিথ্যা কথা কহিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বাল্যকালে বালকস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য তাঁহার মধ্যে অনেকই দেখা গিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সঙ্গে একটা দৃঢ়তা বা দৃঢ়ব্রততাও জড়াইয়াছিল। একবার কোনও বিষয় ধরিলে কাহারও সাধ্য ছিল না তাঁহাকে সে বিষয় হইতে নিরস্ত করে। এই দৃঢ়ব্রততা তাঁহার ধর্ম্মজীবনেরও একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল। বাল্যকালে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা এবং নির্ভীকতারও অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্কুবাবুর গ্রন্থে এ সম্বন্ধে একটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আছে।

বালক বিজয়কৃষ্ণের ঘোড়া চড়িবার অত্যন্ত সখ ছিল। একবার সঙ্গীদের লইয়া স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আস্তাবল হইতে তাঁহার ঘোড়া বাহির করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করেন। ডেপুটী বাবুর লোক যখন এই তুষ্কর্ম্মের সন্ধান পাইয়া অপরাধীদিগকে ধরিতে গেল, তখন

তাঁহার সঙ্গীরা সকলেই যে যে-পথে পারে পলাইয়া গেল, কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ধরা পড়িবার ভয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ডেপুটী বাবুকে আসিয়া কহিলেন, তাঁহার ঘোড়া চড়িবার বেশী সখ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি এরূপ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার কথাতে সাহস, সত্যবাদিতা, ও সরল স্বভাবের পরিচয় পাইয়া উক্ত ডেপুটী মহোদয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং বালককে কোনরূপ তিরস্কার করেন নাই।

যেমন সত্যনিষ্ঠা সেইরূপ ইন্দ্রিয়সংযমও যৌবনাবধিই তাঁহার চরিত্রের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। বালক বিজয়কৃষ্ণ চঞ্চল ও একগুঁয়ে ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার চরিত্রে গাম্ভীর্য্য এবং তেজ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এরূপ শোনা যায় যে, সে সময়ের শান্তিপুরের বালক ও যুবকদিগের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণের একটী দল ছিল। ইহারা গ্রামের দুষ্টদিগকে অত্যন্ত শাসন করিয়া রাখিত। লম্পট ও মাতালের দল এজন্য বিজয়কৃষ্ণকে ভয় করিয়া চলিত। বিজয়কৃষ্ণের চরিত্র প্রথম-যৌবনাবধিই লোকোত্তরদিগের চরিত্রের মতন কুসুম অপেক্ষা কোমল এবং বজ্রাদপি কঠোর ছিল। একবার তাঁহার কোনও বন্ধু তাঁহার মন পরীক্ষার জন্য মুখে মদ মাখিয়া বিজয়কৃষ্ণের নিকটে আসিয়াছিলেন। ইহাতে বিজয়কৃষ্ণ এই বন্ধুকে মদ্যপায়ী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি এরূপ বিরাগ প্রকাশ করেন যে সেই দুঃখে তিনি দেশত্যাগী হইয়া যান।

১১

বেদান্ত অধ্যয়ন ও মত-পরিবর্ত্তন

বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরে গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের টোলে ভর্ত্তি হইয়া ব্যাকরণ-পাঠ সাঙ্গ করিয়া সতের বৎসর বয়সের সময় সতীর্থ অঘোরনাথ গুপ্তের সঙ্গে টোলের পড়া ছাড়িয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য কলিকাতায় আসেন। সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া বিজয়কৃষ্ণের মনে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে। বিজয়কৃষ্ণ বেদান্ত পড়িতে লাগিলেন। এই বেদান্ত অধ্যয়নের ফলেই প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের উপরে তাঁহার পুরুষানুগত বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়। সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়াও বিজয়কৃষ্ণ মাথায় টিকি, গলায় মোটা তুলসীর মালা ও কপালে তিলক ধারণ করিতেন, এবং প্রতিদিন নিষ্ঠাসহকারে সন্ধ্যা-বন্দনাদির অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু বেদান্ত পড়িয়া তাঁহার শৈশব ও প্রথম-যৌবনের ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গেল। জীবই যখন ব্রহ্ম, তখন কে কার পূজা করিবে? এই ব্রহ্মকে না জানিলে আর কিছুতেই জীবের মুক্তি হয় না।

যদাচর্ম্মবদাকাশং চেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ
তদাদেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি।

মানুষ যখন এক টুকরা চামড়ার মত এই আকাশকে গুটাইয়া নিজের হাতের মুঠার ভিতরে আনিবে, তখনই কেবল দেবতাকে বা ব্রহ্মকে না জানিয়াও জীবের দুঃখের অন্ত হইবে; অর্থাৎ

আকাশকে মুঠার ভিতরে গুটাইয়া আনাও যেমন অসম্ভব, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিলাভও অসাধ্য। উপনিষদ এই কথাই কহেন। দেবতার ভজনায় ঋদ্ধি-সিদ্ধি সম্ভবও হইতে পারে কিন্তু মুক্তিলাভ আদৌ-সম্ভব নহে। দেবতারা পর্য্যন্ত মুক্তি-ভিখারী হইয়া ব্রহ্মের ভজনা করেন। যাঁহারা নিজে মুক্তির ভিখারী, তাঁহারা অপরকে মুক্তি দিবেন কি করিয়া? বেদান্ত-শাস্ত্রে নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে বারংবার এ সকল উপদেশ দিয়াছেন; সুতরাং বেদান্ত পড়িয়া বিজয়কৃষ্ণের বাল্যের ও প্রথম যৌবনের "কোমল" শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যে বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিন পূর্ব্বে নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, দেবার্চ্চনায় যাঁহার নিরতিশয় আনন্দ ও তৃপ্তিবোধ হইত, এখন সেই বিজয়কৃষ্ণই সমুদয় পূজা-অর্চ্চনা বর্জ্জন করিয়া "অহং ব্রহ্ম" এই অভিমানের অনুশীলন করিতে লাগিলেন।

বিজয়কৃষ্ণের জীবন-নাট্যের এই ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্কটীর কথা সকলে জানেন না। যাঁহারা জানেনও, তাঁহারাও ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম ভাল করিয়া অনুধাবন করিয়াছেন কিনা সন্দেহের কথা। কিন্তু বেদান্ত পড়িয়া যে বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম আঁচড় পড়ে এবং এই বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের প্রেরণাতেই যে তাঁহার বাল্যকালের ও প্রথম যৌবনের ধর্ম্মবিশ্বাস কেবল নড়িয়া যায় তাহা নহে, উহা একেবারে ভাঙিয়া পড়ে; বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসে ইহা একটা অতিবড় কথা। বিজয়কৃষ্ণ যখন কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন, সে সময়ে নূতন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সহরে বিপ্লবের বান ডাকিয়াছিল। নূতন ইংরাজী-নবীশেরা পিতৃ-পিতামহ-

দিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও সংস্কার নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিরঙ্কুশ যুক্তিবাদের আশ্রয় লইতেছিলেন। ইহাতে যে কেবল ধর্ম্মবিশ্বাসই ভাঙ্গিতেছিল তাহা নহে, কুলাগত সদাচার পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। নূতন ইংরাজী-নবীশেরা একদিকে সৎসাহসী এবং সত্যনিষ্ঠ হইলেও, অন্যদিকে পানাহারাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতেছিলেন। অনেকেই মদ্যপান আরম্ভ করেন। কাহারও কাহারও মধ্যে অসংযত ইন্দ্রিয়ভোগও প্রকাশ পাইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের পাশেই হিন্দু কলেজ ছিল। উভয় কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা শুনা বা মেশা মিশি হইবার কোনই অন্তরায় ছিল না। সে সময়ে বিজয়কৃষ্ণ যদি বেদান্ত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত না হইয়া নূতন ইংরাজী-নবীশদিগের দলে ভিঁড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কার কখনই এমনভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতে পারিত না। তাঁহার চিত্তের নির্ম্মলতা ও চরিত্রের অসাধারণ শুচিতা অপরাজেয় দুর্গের পরিখার মতন তাহার সহজ ও "কোমল" শ্রদ্ধাকে এই বৈদেশিক ভাব-বন্যা আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। ইংরাজী পড়িয়া কিম্বা ইংরাজী নবীশদিগের সহবাসে তাঁহাদের ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, গোঁসাই পৈতৃক ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের মর্ম্ম কথার অনুশীলনে এই তথ্যটা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

ইহার অর্থ এই যে, সন্দেহবাদ বা যুক্তিবাদের আঘাতে গোস্বামী মহাশয়ের শ্রদ্ধা বিচলিত হয় নাই—হইলে সে শ্রদ্ধা যে তাঁহার প্রকৃতির স্তরে স্তরে জড়াইয়া ছিল, এরূপ অনুমান করিতে পারিতাম না। বেদান্ত পড়িয়া প্রচলিত দেববাদে এবং দেবোপাসনাতেই তাঁহার অনাস্থা জন্মিল, কিন্তু যে আস্তিক্য-বুদ্ধি তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে নিহিত ছিল, সেই আস্তিক্য-বুদ্ধি কেশাগ্রপরিমাণেও বিচলিত হইল না, বরং

বেদান্ত অধ্যয়নের ফলে তাহা আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র বস্তু এমন নহে। এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয় ছাড়াও সত্য-বস্তু আছে, এই যে প্রতীতি ইহাকেই আমাদের শাস্ত্রে আস্তিক্য-বুদ্ধি কহে। এ ছাড়া আর কিছু নাই যাহারা বলে, শাস্ত্র যাহাদিগকে "নান্যদস্তীতিবাদিনঃ" কহিয়াছেন, তাহারাই নাস্তিক। বেদান্ত এই নাস্তিক্যের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছেন। বেদান্তের কোনও কোনও ব্যাখ্যাতে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জগতেরই সত্য অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহের ছায়ামাত্র প্রকাশ করেন নাই। আমাদের দেশে কেবল চার্ব্বাক বা লোকায়তদিগকেই নাস্তিক কহিতেন। ইহারা ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনও কিছু মানিতেন না। বেদান্ত চার্ব্বাকমতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং এই বেদান্ত-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া বিজয়কৃষ্ণের প্রকৃতিগত আস্তিক্য-বুদ্ধি বিচলিত বা নষ্ট হওয়া দূরে থাক, আরও সুদৃঢ় হইয়াই উঠিয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। মানুষ সব সহিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রকৃতির মূলে যে সত্য বা শক্তি থাকে, তাহার উপরে আঘাত সহিতে পারে না। সেখানে আঘাত পড়িলে তাহার সমুদয় প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, এবং আক্রমণকারীকে হয় বিনাশ করে কিম্বা চিরদিনের জন্য দূরে ঠেলিয়া রাখে। আগন্তুক ইউরোপীয় সাধনার নাস্তিক্যাভিমুখী যুক্তিবাদের আক্রমণে বিজয়কৃষ্ণের পৈতৃক ধর্ম্মবিশ্বাসকে নষ্ট করা দূরে থাক, টলাইতেও পারিত না। তাঁহার প্রকৃতি এ আঘাত সহিতে পারিত না। বেদান্ত পড়িয়া তাঁহার এই বিশ্বাস যে ভাঙ্গিয়া যায়, ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা সম্পাতের ফল নহে। ইহার সঙ্গে তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনা ও সিদ্ধির একটা নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে।

১২

বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিবাদ

সংস্কৃত কলেজে যে ভাবে বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপনা হয়, সে ভাবে বেদান্ত পড়িয়া কখনও সত্য বেদান্ত-তত্ত্ব অধিগত করা সম্ভব হয় না। আমাদের প্রাচীন বেদান্তবিদ্যা কেবল কেতাবী বিদ্যা ছিল না। এখনও এ দেশে এমন বৈদান্তিক পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা কেবল বেদান্ত পড়েন নাই, কিন্তু বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান যথাবিধি সাধন করিয়াছেন। সেই সাধন-পথে বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে বিজয়কৃষ্ণের জীবন অন্যভাবে গড়িয়া উঠিত। তিনি সে অবস্থায় আমাদের যুগের মানুষ হইতে পারিতেন না। কেবল বেদান্তদর্শনের আলোচনা করিয়া সহজেই বৈদান্তিক মতবাদে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারা যায়। কিন্তু এ পথে অপরোক্ষানুভূতিরদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভব হয় না। পরজীবনে গোস্বামী মহাশয়ের এই অপরোক্ষানুভূতি লাভ সম্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের সাধন-পথে যাইয়াই তাঁহার এই সিদ্ধি লাভ হয়। সে সাধন-পথ এ যুগের প্রশস্ত পথ, মধ্যযুগের কঠোর ও জটিল পথ নহে। গোস্বামী মহাশয় সংস্কৃত কলেজে পড়িয়া যে বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য ব্রহ্মজ্ঞান নহে, একটা মতবাদমাত্র ছিল। আর এই জন্যই এই ব্রহ্মবাদে তিনি স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

সত্য বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানেতেও একটা ভক্তির আশ্রয় মিলে। নির্গুণ ব্রহ্মবাদীরাও ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-সিদ্ধির সাধনরূপে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই সগুণ উপাসনায় ভক্তির অনুশীলন হয়। কিন্তু ভক্তি

তাঁহাদের সাধ্য নয়, সাধন পথে একটা সাময়িক আশ্রয় মাত্র। এ সকল কথা কেতাব পড়িয়া জানা সম্ভব নহে; জানিলেও বোঝা কঠিন। সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া বিজয়কৃষ্ণ বৈদান্তিক সাধন-পথের কোনও খবরই পান নাই। কেবল "অহং ব্রহ্ম," "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"—এইরূপ কতকগুলি মামুলি বাক্যেরই জ্ঞান লাভ করেন।

বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের তিন সোপান। প্রথম শ্রবণ, দ্বিতীয় মনন, তৃতীয় নিদিধ্যাসন। শ্রবণ অর্থ গুরুশাস্ত্রমুখে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় উপদেশ শোনা, মনন অর্থ বিচার পূর্ব্বক সেই উপদেশের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, নিদিধ্যাসন অর্থ বারংবার গুরুশাস্ত্র-উপদেশের মর্ম্ম চিন্তা করিয়া তাহাতে কায়মনঃপ্রাণে প্রতিষ্ঠালাভ করা। শ্রবণের বাহন শব্দ। কিন্তু শব্দ শুনিলেই তাহার যথাযথ অর্থ বোধ হয় না। শব্দ বস্তু বা বিষয়ের সাঙ্কেতিক চিহ্নমাত্র। যতক্ষণ না বস্তু বা বিষয়ের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, ততক্ষণ শব্দের সত্য অর্থ প্রকট হয় না। আর ততক্ষণ পর্য্যন্ত শব্দের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে বিচার অবলম্বন করিতে হয়। ইংরাজীতে এই বিচারকে criticism কহে। বিচারের বাহন যুক্তি। শাস্ত্র-বাক্যের বা গুরু-উপদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে সঙ্গতি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করাই বিচারের লক্ষ্য। এই বিচারের দ্বারা শাস্ত্রের বা গুরুর উপদেশের সত্য অর্থটা যে কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই বিচারের ফলে গুরু-শাস্ত্র-বাক্যে প্রতীতি জন্মে। এই প্রতীতি জন্মিলেই যে সত্যলাভ হইল, এরূপ মনে করা যায় না। এই প্রতীতিকে ইংরাজীতে intellectual conviction বলা যায়। এই intellectual convictionএ আমাদের মতবাদকে দৃঢ় করে মাত্র; কিন্তু সেই মতকে জীবনময়—জ্ঞানে, ধ্যানে, কর্ম্মে গড়িয়া তুলিতে পারে না। এইজন্য মননেতেই

সত্য সাধনার শেষ হয় না। মননের পরে নিদিধ্যাসন। পুনঃ পুনঃ ধ্যানের ফলে এই নিদিধ্যাসনের দ্বারা সত্যবস্তু ক্রমে সাধকের নিকটে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন, তখন সাধকের সেই সত্যসম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। সাধক সর্ব্বেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণের দ্বারা সেই সত্যেতে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই ভাবেই ব্রহ্মসাধনে সাধকের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, উপনিষদ কহেন, সাধকের হৃদয়-গ্রন্থি আল্‌গা হইয়া যায়, সকল সংশয় নিঃশেষে দূর হইয়া যায়, এবং তাহার সকল কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

ইহাই বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাচীন পরীক্ষিত পথ। ইহা সাধনের পথ। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপালাভ করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া এপথে চলিতে হয়। সে-গুরু যদি বেদান্ত পড়ান, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের পথে শিষ্যকে পরিচালিত করেন, তাহা হইলেই কেবল এই বেদান্ত অধ্যয়নের দ্বারা, শিষ্যের সুকৃতি থাকিলে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। বিজয়কৃষ্ণ সংস্কৃত কলেজে যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন, তাহা কেতাবী বিদ্যামাত্র। সাধন-পথে এ অধ্যয়ন করিতে যান নাই, তাহা লাভও করেন নাই। এইজন্য এই মৌখিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দ্বারা তাঁহার দেবতায় বিশ্বাসই ভাঙ্গিয়া গেল; কৌলিক পন্থার অনুসরণ করিয়া দেবতার বিগ্রহের সেবা, অর্চ্চনাতে যে আনন্দ ও শান্তি পাইতেন তাহাই নষ্ট হইয়া গেল; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে যে পরাশান্তি ও পরম আনন্দ লাভ হয়, তাহা পাইলেন না। এই শুষ্কতার ভিতরে গোঁসাই বেশী দিন স্থির থাকিতে পারিলেন না। প্রাণের ভিতরে একটা দুর্ব্বিষহ শূন্যতা জাগিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

১৩

মুক্তি-জিজ্ঞাসা

বিজয়কৃষ্ণ একটু বড় হইয়া উঠিলে, কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্ব হইতেই পৈতৃক ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁহাদের অনেক শিষ্য ছিলেন। শিষ্যেরা যে বৃত্তি দিতেন, তাহার দ্বারাই একরূপ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। এই বৃত্তিসংগ্রহের জন্য গোঁসাইকে শিষ্যদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত।

বিজয়কৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষা দিতেন কি না জানি না, কিন্তু শিষ্যেরা তাঁহার পাদ-পূজা করিতেন, এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই এইরূপ এক ঘটনাতে বিজয়কৃষ্ণের প্রথম মুক্তি-জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠে। বগুড়ার অন্তর্গত কোনও এক গ্রামে এক শিষ্য বাড়ীতে যাইতে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার পা-পূজা করিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! আমি অকুল ভবসাগরে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি, কিছুতেই ইহা হইতে উদ্ধার হইতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।" এই বর্ষীয়সী মহিলা বিজয়কৃষ্ণের নিকটে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমানের কোনও হেতু নাই; গুরুপুত্ররূপেই তাঁহার পাদ-পূজা করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ শিষ্যাণীর মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের মধ্যেও মুক্তির প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমার কি এই ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা আছে? "আমি স্বয়ং কিরূপে পরিত্রাণ পাইব, তাহারই নিশ্চয়তা নাই, আমি পরিত্রাণ করিব কিরূপে?" এইরূপে পৈতৃক ব্যবসা করিতে যাইয়াই

সর্ব্বপ্রথমে বিজয়কৃষ্ণের আত্ম-চৈতন্যের উদয় হয়, এবং তিনি নিজ-মুক্তির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েন। হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা এই মুক্তির পথ পাইবেন বলিয়াই গোঁসাই সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া বেদান্তাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বেদান্ত পড়া শেষ হইল। কেতাবী ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন তিনি যে বস্তু খুঁজিতেছেন, তাহা পাওয়া গেল না। বেদান্ত পড়িয়া কেবল প্রাচীনের আশ্রয়ই ভাঙ্গিয়া গেল, কোনও নূতন আশ্রয় মিলিল না।

১৪

ব্রাহ্ম-সমাজের সন্ধান

ইহার পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের কথা শুনিয়াছিলেন। বগুড়ায় পৈতৃক ব্যবসার উপলক্ষে শিষ্যবাড়ী যাইয়া সেখানকার ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। বগুড়ায় পূর্ব্বতন প্রবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত মহাশয় বঙ্কুবাবুকে লিখিয়াছেন :—

"গোস্বামী মহাশয় বগুড়ার উত্তরদিকস্থ কোনও গ্রামে শিষ্যবাড়ীতে আসিতেন এবং শিষ্যবাড়ী হইতে বগুড়া আসিয়া শিববাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীনাথ রায়, হারাধন বর্ম্মণ এবং গোবিন্দচন্দ্র পাঁড়ে নামক তিনজন শিক্ষিত লোকের সহিত মিলিত হইতেন। ইহারা সকলেই একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহারা নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ ও পৌত্তলিকতা-পরিবর্জ্জন, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতেন। গোস্বামী মহাশয় ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া ইহাদের ব্যবহারে ও কার্য্যে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলেন। তিনি ইহাদের সঙ্গে

আলাপাদি করিয়া এবং আত্মচিন্তা বলে গুরুব্যবসায় অন্যায় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে গুরুব্যবসায় ছাড়িয়া স্বাধীন-ব্যবসায় অবলম্বনে ইচ্ছুক হইলেন।”

বগুড়ার ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্ব্বে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে লোকমুখে নানা কুৎসা শুনিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসভায় যাহারা যায় তাহারা সেখানে বেদপাঠ ও সঙ্গীত শোনে, এবং তাহার পর সকলে মিলিয়া সুরাপান ও মাংস ভোজন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা সাঙ্গ করে। বৈষ্ণব-সন্তান বিজয়কৃষ্ণের মনে এই কারণে ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব জাগিয়াছিল। কিন্তু বগুড়ার কিশোরী নাথ রায় প্রভৃতি ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে পরিচিত হইয়া এই ভাব অনেকটা কমিয়া গেল। ব্রাহ্ম মতবাদ তিনি গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু এই ব্রাহ্মদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধতায় ও ধর্ম্মপ্রাণতায় “এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, মতভেদ-সত্ত্বেও তাঁহাদের সঙ্গে স্বীয় অবস্থার তুলনা করিয়া নিজেকে অত্যন্ত হীন মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিলেও পবিত্র হওয়া যায়, তাঁহার মনে এই বিশ্বাস জন্মিল এবং তাঁহাদের সরলতা, বিনয় এবং মধুরতায় আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুতা জন্মিল।” কিন্তু এই সখ্য-বন্ধনও উভয় পক্ষের মতবাদের বিরোধ নষ্ট করিতে পারিল না। কিশোরীনাথ রায় ব্রাহ্ম, আর বিজয়কৃষ্ণ পূর্ব্বের ন্যায় বৈদান্তিকই রহিয়া গেলেন। তবে বগুড়া হইতে বিদায় দিবার সময় বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাকে কলিকাতায় যাইয়া ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যোগ দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী উপদেশ ও উপাসনা শুনিলে এই সরল বিশ্বাসী পবিত্র-চিত্ত যুবকের মন সহজেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইবে।

কলিকাতায় ফিরিয়া নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে পড়িয়া বিজয়কৃষ্ণ বগুড়ার ব্রাহ্মদিগের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম দিনেই তাঁহার সমস্ত টাকাকড়ি চুরি যায়। যে বাসায় থাকিতেন সেখানে দু'বেলা নগদ পয়সা দিয়া খাইতে হইত। কিন্তু তাঁহার হাতে একটীও পয়সা ছিল না। "এজন্য বাসা হইতে বাহির হইয়া গিয়া আর ফিরিলেন না। গোলদীঘির ধারে ও পথে শুইয়া বসিয়া কখনও কখনও সমস্ত দিনরাত্রি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বাসস্থান অন্বেষণ করেন, ক্ষুধা অসহ্য হইলে অঞ্জলি পুরিয়া জলপান করেন ; আর রজনীতে বারাণ্ডায় শয়ন করিয়া অতিকষ্টে কাটাইতেন।" এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। কলিকাতায় বিজয়কৃষ্ণের বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। বিপদকালে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলে যদি কেহ অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বন্ধুতা নষ্ট হইবে, এই ভয়ে বহুক্লেশ সহ্য করিয়াও তিনি তাঁহাদের কাহারও দ্বারস্থ হইলেন না। ক্রমে বহু চেষ্টায় কোনও ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু এখানে মনের শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। গৃহস্বামী নিজে যে কেবল সুরাপান করিতেন তাহা নহে, বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া নিজের দলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন ; বিজয়কৃষ্ণকেও তিনি দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"তাঁহারা আমাকে সুরাপায়ী করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। আমি প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কারপূর্ব্বক সুরার নিন্দা করিতাম। আমি অদ্বৈতবংশের গোস্বামী, আমি সুরাপান করিলে অথবা অন্য কোনও পাপাচরণ করিলে আমার নির্ম্মল পিতৃকুল কলঙ্কিত হইবে, কেবল এই সংস্কার অনেক সময় আমাকে কুসংস্কার-নরক হইতে রক্ষা করিয়াছে।"

১৫

ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ

এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যখন বিজয়কৃষ্ণ অত্যন্ত অশান্তিতে বাস করিতেছিলেন, তখন একদিন বগুড়ার ব্রাহ্মদিগের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহারা যে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে যাইতে বলিয়াছিলেন, সে কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, "ব্রহ্মজ্ঞানীরা তবলা বাজাইয়া গান করে, বেদ পাঠ করে, অবশেষে সুরাপান ও মাংসভোজন করিয়া তাহাদের কার্য্য শেষ করে।" সুতরাং ব্রাহ্মসমাজে যাইবার জন্য মনে কোনও উৎসাহই অনুভব করিলেন না। অন্যদিকে বগুড়ার ব্রাহ্মদিগের প্রতি তাঁহার এতটা শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করা একেবারে সহজ হইল না। তাঁহার অন্তরেও অত্যন্ত অশান্তি ও উদ্বেগ জাগিয়াছিল, কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলেন না। এই সকল বিবিধভাবের মাঝখানে পড়িয়া বিজয়কৃষ্ণ একবার ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া নিজের চক্ষে সমাজের ক্রিয়া-কলাপ দেখিতে ইচ্ছা করিলেন।

"সেদিন বুধবার, তিনি সায়ংকালে ব্রাহ্মসমাজে গমন করিলেন। তথাকার আলোকমালা, তানলয়যুক্ত মধুর সঙ্গীত, ভক্তিভাবে স্তোত্রপাঠ, বহুসংখ্যক লোকের গম্ভীর ভাব দর্শন ও শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার নিকটে স্বর্গধাম বলিয়া মনে হইল, এবং ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে তাঁহার যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, উহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায়, তৎপরিবর্ত্তে শ্রদ্ধাসমন্বিত উদার ভাব আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল। ঐ দিন প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদীতে আসীন

ছিলেন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি, সতেজ বাণী, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সকলই এই সরলচিত্ত যুবকের হৃদয়কে স্পর্শ করিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "পাপীর দুর্দ্দশা এবং ঈশ্বরের বিশেষ করুণা" সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী ভাষায় যে উপদেশ দিলেন তৎশ্রবণে তাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল, এবং সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়, তেমনি সত্য প্রকাশিত হইয়া তাঁহার মনের সংশয়-অন্ধকার বিদূরিত করিল। তখনকার ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। বস্তুতঃ তিনি একটি নূতন মানুষ হইয়া গৃহে আসিলেন।"

বিজয়কৃষ্ণ নিজে এইদিনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কহিয়াছিলেন :— "এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমার পূর্ব্বেকার ভক্তিভাব স্মৃতিপথে উদিত হইল। এতদিন যে ইষ্টদেবতার পূজা করি নাই, তজ্জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, সমস্ত শরীর গলদঘর্ম্ম ও কম্পিত হইতে লাগিল। অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিয়া অন্তরে দয়াময়ের নিকটে এই প্রার্থনা করিলাম, হে দয়াময় ঈশ্বর, প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে আমার বিশ্বাস হয় না, অন্য কোনও ধর্ম্মেও আমার বিশ্বাস নাই, ধর্ম্মসম্বন্ধে আমার ন্যায় হতভাগ্য বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ নাই। যখন পৌত্তলিক-ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল, তখন ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতাম, এখন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। এই মাত্র শুনিলাম, তুমি অনাথের নাথ, প্রভো, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি আমাকে রাখ, আর আমি কোথাও যাইব না, তোমার দ্বারে পড়িয়া রহিলাম!"

এই দিন হইতে বিজয়কৃষ্ণের জীবন এক নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। এই আত্মনিবেদনের ফলে তাঁহার চিত্ত শান্ত হইল। বেদান্ত অধ্যয়নের পরে প্রাচীন ধর্ম্মে অবিশ্বাস হইলে অন্তরে যে গভীর শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন, তাহার বেদনার উপশম হইল।

সেইদিন হইতে বিজয়কৃষ্ণ মনে মনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে নিজের ধর্ম্মজীবনের গুরুর পদে বরণ করিয়া লইলেন। সেইদিন হইতে বিজয়কৃষ্ণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদিষ্ট ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কতিপয় সহাধ্যায়ী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যাইতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত কলেজে বিজয়কৃষ্ণের সহাধ্যায়ী ছিলেন। পরে "আর্য্য-দর্শনের" সম্পাদকরূপে তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বিজয়, অঘোর, শিবনাথ, উমেশ (মুখোপাধ্যায়) ও আমি এই পাঁচজনের মধ্যে এক সময়ে সুদৃঢ় প্রণয়বন্ধন ছিল। সংস্কৃত কলেজের ঘোর নাস্তিকতার সময় আমরা পাঁচ বন্ধু "ভাগবত" বলিয়া উপহাসিত হইতাম। সেই ঠাট্টাবিদ্রুপের মধ্য দিয়া আমাদের ভগবদ্ভক্তি দিন দিন উপচিত হইতে লাগিল। গৃহে এবং কলেজে নিরন্তর নির্য্যাতনে আমাদের পরস্পরের প্রেম দিন দিন অধিকতর ঘনীভূত হইতে লাগিল। বিজয় আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং তিনি আমাদের দলের একরূপ নেতা ছিলেন। আমরা নির্য্যাতনভয়ে কয়জনে মিলিত হইয়া নির্জ্জনে উপাসনা করিতাম। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর পরিমার্জ্জিত মনে করিয়া আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে নিয়মিতরূপে যাইতাম।"

বিজয়কৃষ্ণ কেবল সপ্তাহান্তে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে গিয়াই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের চরিতার্থ লাভ করিতেন না। প্রতিদিন নির্জ্জনে ব্যাকুল-ভাবে পরমেশ্বরের নিকটে আত্মোন্নতির জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং সর্ব্বদাই আশা, উৎকণ্ঠা ও অনুরাগের সহিত প্রার্থনার সফলতার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। এই সাধন-ভজনের ফলে অন্তরে যখন

যে ভাব ফুটিয়া উঠিত, তাহার অনুযায়ী জীবন-পরিচালনার জন্য তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, পরে 'ধর্ম্ম-শিক্ষা' নাম দিয়া এগুলি মুদ্রিত করেন। এই পুস্তিকার মধ্যে বিজয়কৃষ্ণের সে সময়ের অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম-জীবনের অতি পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কুবিহারী কর মহাশয় এই পুস্তিকার শেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। ইহা পরকে উপদেশ দেওয়া নহে, নিজেকে কোন্ পথে চলিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করা। ইহা উপদেশ নহে, আত্ম-চিন্তা। এই আত্ম-চিন্তা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া বিজয়কৃষ্ণ লিখিয়াছেন ঃ—

"পরমেশ্বরের প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাস না হইলে প্রীতির উদয় হয় না। প্রীতি না হইলে প্রিয়-কার্য্য-সাধন করা যায় না। ঈশ্বরেতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার হৃদয় পাষাণময়, তৎকর্ত্তৃক কোনও পাপই অকৃত থাকে না। সে কখনও নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদন করিতে সক্ষম হয় না। শ্রমজীবী কৃষক কি চির-শুষ্ক মরুভূমিতে সুস্বাদু ফলের প্রত্যাশা করিতে পারে? ঈশ্বরেতে দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপন করিবে। তাঁহাকে প্রীতি করিবে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। সদা সত্য কহিবে, প্রাণান্তেও মিথ্যা কহিবে না। পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা কথা অনুচিত। একটি মিথ্যা কথা বলিলে যদি রাজ্যলাভ হয়, তাহাও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিবে। একটী মিথ্যা না বলিলে যদি সহস্র সহস্র লোক খড়্গহস্ত হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সত্যের জন্য প্রাণ-দান করিবে, তথাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতঃ অব্যর্থ ধৈর্য্যাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিতে না পারিলে মনুষ্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় দমন করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে। সকল মনুষ্যকেই স্নেহ করিবে। দরিদ্রকে ধনদান, রোগীকে ঔষধ, পথ্য-

প্রদান করিবে। নম্রতা ও বিনয়কে অঙ্গের ভূষণ করিবে। প্রাণপণে পরোপকার করিবে। পিতামাতাকে ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করিবে। যাহা মুখে কহিবে, কার্য্যেও তাহা করিবে; বাক্য ও কার্য্য একপ্রকার না হইলে কপটতা করা হয়। অতএব পৌত্তলিকতার সহিত কিছুমাত্র সংশ্রব রাখিবে না; উপবীত প্রভৃতি পৌত্তলিকতার কোনও প্রকার চিহ্ন ধারণ করিবে না। যাঁহারা পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব রাখেন এবং উপবীত প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করেন, তাঁহারা যদি ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে ভয়ানক কপটাচার করা হয়। যিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্ত-সমাহিত চিত্তে ঈশ্বরকে প্রীতি করেন এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করেন তিনিই ব্রাহ্ম। এইরূপ ব্রাহ্ম হইবে।"

"পাপ-চিন্তা মনে করিবে না; পাপালাপ মুখে আনিবে না। পাপকার্য্য প্রাণান্তেও আচরণ করিবে না। ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিবে। কি বিদ্যাধ্যয়ন, কি পরিবার-প্রতিপালন, কি অর্থোপার্জ্জন, সমুদয় কার্য্য ঈশ্বরের আদেশ বলিয়াই সম্পন্ন করিবে। যশোমান-বিস্তারের জন্য একটি কার্য্যও করিবে না। দেবদেবী পূজা করা ও জাতিভেদ স্বীকার প্রভৃতি যেরূপ পৌত্তলিকতা, যশোমান ও ইন্দ্রিয়গণের অধীনতাও সেরূপ পৌত্তলিকতা। সম্পূর্ণরূপে এই উভয়বিধ পৌত্তলিকতা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক হইবে। যেরূপ ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিবে, সেইরূপ প্রত্যেক মানুষকে ভ্রাতা বলিয়া অকৃত্রিম প্রীতি স্থাপন করিবে। এইরূপে জীবনকে মধুময় করতঃ ধর্ম্মের উন্নত সোপানে আরোহণ করিবে।"

১৬

উপবীত ত্যাগ

শান্তিপুরে একবার বিজয়কৃষ্ণ উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার জননী, তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিলে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবেন এই ভয় দেখাইলে, জননীর আর্ত্তনাদনিবারণের জন্য পুনরায় উপবীত ধারণ করেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রাণে একটা আগুন জ্বলিয়া রহিল। গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, "উপবীত ত্যাগ না করাতে আমার মনে অত্যন্ত অশান্তি হইতে লাগিল, এমন কি প্রতিদিন প্রার্থনার সময় হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। লোকে বলে, পৈতা কি কামড়ায় ? বাস্তবিক উহা কালভুজঙ্গের ন্যায় প্রতিদিন আমাকে দংশন করিতে লাগিল।"

স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় প্রথম উপবীত ত্যাগ করেন। কিন্তু সে কালের কি ধর্ম্ম-সংস্কারক, কি সমাজ-সংস্কারক কেহই জাতিভেদ না মানিলেও জাতিভেদের চিহ্নস্বরূপ উপবীত ধারণ যে অসঙ্গত ইহা মনে করিতেন না। এমন কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত উপবীত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ এ বিষয়ে তাঁহার নিকটে জিজ্ঞাসু হইলে মহর্ষি বলেন, "উপবীত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য, উপবীত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট হয়। এই দেখ আমি উপবীত রাখিয়াছি"। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ বিদেশীয় শিক্ষার প্রেরণায় কিম্বা সমাজসংস্কারের কামনায় জাতিভেদ বর্জ্জন করেন নাই। তিনি ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ভাবিতেন, এবং প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধে ভ্রাতা বলিয়া অকৃত্রিম প্রীতি-সাধন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। ঈশ্বরের উপাসনা এবং মানুষের

সেবা, এই দুইটীকে তিনি ধর্ম্মলাভের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর ঈশ্বরকে লাভ করাই তাঁহার নিকটে ধর্ম্মসাধনের চরম লক্ষ্য ছিল। যাহাতেই এই লক্ষ্যলাভের ব্যাঘাত জন্মায়, তাহাকেই তিনি বিষবৎ বর্জ্জন করিতেন। এই জন্যই তিনি উপবীত পরিত্যাগ করেন। তিনি নিজে লিখিয়াছেন, যতদিন তিনি উপবীত পরিত্যাগ করেন নাই, ততদিন পর্য্যন্ত—"উপবীত রাখা অসত্য ব্যবহার, অসত্য ব্যবহার করিলে ঈশ্বরদর্শন হইবে না ; এই ভয়ে আমার প্রাণ অস্থির হইত।"

১৭

ডাক্তারি-শিক্ষা

যেদিন বগুড়ায় শিষ্য বাড়ীতে যাইয়া বৃদ্ধা শিষ্যাণীর কাতর প্রার্থনা শুনিয়া বিজয়কৃষ্ণের মনে মুক্তি-জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল—"আমি নিজে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমি অপরের পরিত্রাণ করিব কিরূপে ?" সেইদিন হইতেই "আর এইরূপ কপটাচরণ করিব না", এই সঙ্কল্প তাঁর অন্তরে জাগিয়া উঠে। এই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অল্পদিন মধ্যে সংস্কৃত পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বেই সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগে যাইয়া ভর্ত্তি হয়েন। ডাক্তারী শিক্ষা করিবার সময়েই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন :—
"ঐ সময়ে গোঁসাই তিনু চাটুর্য্যের বাড়ীতে থাকিতেন। একদিন একজন আসিয়া বলিলেন, 'ওরে বিজয় গোঁসাই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে, চল তাকে দেখতে যাই।' আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া তাঁহাকে

দেখিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যা হইলে বিদ্রূপকারী বন্ধুগণের সকলেই ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু আমি তথায় রহিলাম। বিজয়বাবু আমার পরম বন্ধু, তিনি আমাকে আগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে আমরা দুই বন্ধুতে যখন আহার করিতে বসিলাম, তখন ভোজন-পাত্র দেখিয়া অবাক্ হইলাম। উহা আর কিছুই নয় মেটে সাণুক। আমি বলিলাম, 'ও বিজয়, একি, এযে মেটে সাণুক।' তিনি বলিলেন, 'যাও যাও, কাঁসাতে আর মাটিতে প্রভেদ কি?' ইহার পর একজন ঝিকে ভাত নিয়ে আসিতে দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'এ কি? বামনের জাত মারলে?' তিনি বলিলেন, 'ও কি? জাত-টাত আবার কি? ওসব কিছু নয়। এখনও তোমার কুসংস্কার গেল না?' যাহা হউক আহারাদি ত কোনওরূপে শেষ হইল, কিন্তু সমুদয় রাত্রি আমার শরীর ঘিন্ ঘিন্ করিতে লাগিল। ভাল ঘুম হইল না।"

এই সামান্য ঘটনা উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, বিজয়কৃষ্ণ কোন্ ভাবের প্রেরণায় সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজীও পড়িতেছিলেন।

গোঁসাই ইংরাজী শিক্ষার কোনই ধারা ধারিতেন না। অথচ তাঁহার পক্ষে ছুঁতমার্গ পরিত্যাগ করা যত সহজ হইয়াছিল, তখনও ইংরাজীনবীশ শাস্ত্রী মহাশয়ের পক্ষে তত সহজ হয় নাই। গোঁসাই বেদান্ত পড়িয়াই জাতিবর্ণবিচার যে অবিদ্যামূলক, ইহা শিখিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের সহজ ও বলবতী ধর্ম্মবুদ্ধি তাঁহাকে কখনও কেবল ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে দিত না। তিনি এ সকল উপদেশকে নিজের প্রত্যক্ষ অনুভবের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহার অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া বোধ হইত, আচার-আচরণে

আচরণে তাহার বিরোধীতা করিতে পারিতেন না। যেদিন তাঁহার মনে হইল যে জাতিভেদ মিথ্যা, ইহাতে ঈশ্বরের সার্ব্বজনীন পিতৃত্ব এবং মানবের পরস্পরের ভ্রাতৃসম্বন্ধ কার্য্যতঃ অস্বাকার করিয়া ধর্ম্মের অবমাননা করে, সেদিন হইতেই তাঁহার নিকটে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, জাতিহিসাবে সমান হইয়া গেল। যে চক্ষে তিনি কাঁসাতে ও মাটিতে কোনও প্রভেদ দেখেন নাই, সেই চক্ষে ব্রাহ্মণে এবং শূদ্রেও কোনও প্রভেদ দেখিতে পান নাই; তিনি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কিম্বা ফ্যাসনের অনুকরণ করিতে যাইয়া জাতিভেদ ছাড়েন নাই। তখনকার শিবনাথের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের এই প্রভেদ ছিল। আজীবন বিজয়কৃষ্ণ যখন যাহা করিয়াছেন, সর্ব্বদাই তাঁহার অন্তরের এই বলবতী ধর্ম্মবুদ্ধি হইতে তাহার প্রেরণা আসিয়াছে।

মেডিক্যাল কলেজে বিজয়কৃষ্ণ তিন বৎসর পড়েন। তিন বৎসরেই তখন বাঙ্গালা বিভাগে ডাক্তারি-শিক্ষা শেষ হইত। "স্বাভাবিক সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি বশতঃ (১৮২১ শকের ১লা আষাঢ়ের "ধর্ম্মতত্ত্ব" লিখিয়াছিলেন) শিক্ষক-প্রমুখাৎ শ্রুতবিষয় কখনও তাঁহাকে পরিশ্রম করিয়া আয়ত্ত করিতে হইত না; একবার যাহা শ্রবণ করিতেন অন্য ছাত্রগণের নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতেন।" কিন্তু মেডিকেল কলেজে যে কয় বৎসর পড়িতে হইত, বিজয়কৃষ্ণ সেই কয় বৎসর পড়িলেও শেষ পরীক্ষা দিয়া ডিপ্লোমা লইতে পারিলেন না। এখানে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণের বিরোধ বাধিয়া উঠে। "বিজয়কৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই অন্যায় অবিচার সহ্য করিতে পারিতেন না; সর্ব্বদাই তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেন। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কোনও কোনও অন্যায় আচরণে বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মবুদ্ধিতে আঘাত লাগে।

সকলের প্রতিবিধান করিবার জন্য তিনি সতীর্থদিগকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মঘট করেন। যাহারা প্রথমে কলেজ ছাড়েন নাই, পরে বিজয়কৃষ্ণ গোলদীঘিতে বক্তৃতা দিয়া তাহাদিগকেও নিজের দলভুক্ত করেন। এই বিবাদটা মিটাইয়া দিবার জন্য বিজয়কৃষ্ণ পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হন। বিজয়কৃষ্ণের মুখে আদ্যোপান্ত সকল বিবরণ শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোট লাট বীডন সাহেবকে সকল কথা বলেন। ছোটলাটের তদন্তের ফলে ছাত্রগণ নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হন, এবং কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা পুনরায় ছাত্রদিগকে গ্রহণ করেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ নিজে কলেজে ফিরিয়া গেলেন না। কলেজের তখনকার অধ্যাপক খ্যাতনামা ডাক্তার তামিজ খাঁ বিজয়কৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন :—গোঁসাই ভগবান তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তাই তুমি রক্ষা পাইয়াছ, তুমি কলেজ ত্যাগ করিয়া বড় ভাল করিয়াছ নতুবা তোমাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইত, কেননা তুমি গোলযোগের নেতা ছিলে। বিজয়কৃষ্ণের অন্যতম জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কু বিহারী কর লিখিয়াছেন :- আমরা শুনিয়াছি এই সময়ে ছোটলাট মহোদয় কলেজের অভাব দূরীকরণোদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক রিপোর্ট প্রদান করিতে অনুরোধ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় গোস্বামী মহাশয়ের উপর এই কার্য্যভার অর্পণ করেন। গোস্বামী মহাশয় অনেকগুলি সংশোধন ও নূতন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অর্পণ করিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তদনুসারে রিপোর্ট করেন, এবং ইহাতে কলেজের অনেক উন্নতি হয়, এবং বাঙ্গালা বিভাগ স্বতন্ত্র হইয়া ক্যাম্বেল বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

বিজয়কৃষ্ণ লোকসেবার সঙ্কল্প লইয়াই সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া ডাক্তারি শিখিতে আরম্ভ করেন। ডাক্তারি শিখিতে যাইয়া শারীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার প্রকৃতি-নিহিত স্বাভাবিকী আস্তিক্য-বুদ্ধি এবং ভক্তি-প্রকৃতি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিল। পরজীবনে তিনি অনেক সময় শারীর-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া নিজের ধর্ম্মোপদেশকে ফুটাইয়া তুলিতেন; ইহা সময়ে সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি। একদিন একজন জিজ্ঞাসু তাঁহার নিকটে নিজের জীবনে অন্তরের আদর্শের অনুসরণ করিবার পথে যে সকল দুরতিক্রমণীয় বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিলে, গোঁসাই কহিলেন:—"কোন ভয় নাই, কিছুই ভাবিবেন না; সময় হইলে সকল বাধা-বিঘ্ন আপনা হইতে সরিয়া যাইবে। স্ত্রীলোক যখন প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হন, কি করিয়া সে সন্তান প্রসব করিবেন, ইহা ভাবিয়া আকুল হইয়া থাকেন। কিন্তু ভগবানের এমনি বিধান যে, সময় যখন হয় তখন প্রসূতির শরীরের সকল অঙ্গ সন্তানপ্রসবের উপযোগী হইয়া উঠে, এবং কি করিয়া যে সন্তান-প্রসব হইল ইহা তিনি তখন জানিতেই পারেন না। ধর্ম্ম-জীবনেও এইরূপই ঘটিয়া থাকে। মানুষ নিজের ভিতরের দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা এবং বাহিরের প্রতিকূল অবস্থা দেখিয়া, কি করিয়া যে তার ধর্ম্মলাভ হইবে, তাহা ধারণা করিয়াই উঠিতে পারে না। কিন্তু যখন সময় আসে, তখন ভগবানের কৃপায় সকল বাধাবিঘ্ন আপনা হইতেই সরিয়া যায়, ভিতর বাহির সমুদায় তাহার সিদ্ধিলাভের অনুকূল হইয়া উঠে। তখন কি করিয়া যে তাহার ইষ্টলাভ হইল, যাহা চাহিয়াছিল তাহা পাইল, ইহা বুঝিতেই পারে না এবং এই অঘটন সংঘটন দেখিয়া ভগবানের অপার [illegible]ার নিদর্শন পাইয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভরে আকুল হইয়া উঠে।" "ভয় নাই ভাবিবেন না; সময় আসিলে সকল বাধাবিঘ্ন

আপনা হইতেই সরিয়া যাইবে।” গোস্বামী মহাশয়ের এই কথাগুলি জীবনে কখনও ভুলিব না। এত বড় আশার কথা এ কাণে আর কাহারও নিকট হইতে শুনি নাই।

ডাক্তারি-বিদ্যায় গোস্বামী মহাশয় বিশেষে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ডাক্তারি-ব্যবসায় তিনি অবলম্বন করেন নাই। মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়া গোস্বামী মহাশয় একেবারে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়েন। সে সময়ে ব্রাহ্ম-প্রচারকদিগের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে কোন প্রকারের ব্যবস্থা হয় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যদিগকে প্রয়োজন মত কিছু কিছু বৃত্তিদান করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ কখনও যে মহর্ষির বৃত্তিভোগী ছিলেন, একথা শুনি নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-ব্রত অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সপরিবারে যে সময়ে সময়ে নিরতিশয় আর্থিক অনটন সহ্য করিতে হইয়াছে, একথা জানি। এমন দিন গিয়াছে, যে দিন আহার জোটে নাই। কিন্তু এজন্য বিজয়কৃষ্ণ এক ভগবানের দ্বার ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারে ভিখারী হইয়া উপস্থিত হন নাই। এই সময়ে তিনি শান্তিপুরে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। পৈতৃক ভদ্রাসন বাড়ীর বাহিরের দিকে বাস করিতেন এবং তাহারই এক পার্শ্বে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়াছিলেন। এইরূপে লোকসেবা ও ধর্ম্মপ্রচার কিছুদিন ধরিয়া এক সঙ্গে দুই কাজই করেন।

১৮

সামাজিক উৎপীড়ন

শান্তিপুরে উপবীত-ত্যাগের পরে বিজয়কৃষ্ণ এই প্রথম গমন করেন। তাঁহার বাড়ীতে তখন লক্ষ্মীপূজা হইতেছিল। বিজয়কৃষ্ণের জননী তাঁহাকে ঘরে ডাকিয়া লইয়া সটান তাঁহার পায়ের উপরে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উপবীত গ্রহণের জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ মাতৃভক্তির প্রেরণাতেও নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির দিকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। একদিকে ধর্ম্মহানির ভয়, অন্যদিকে জননীর মর্ম্মঘাতী বেদনা, এই দুই বিরোধী শক্তির মাঝখানে পড়িয়া তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। মায়ের আর্ত্তনাদে বিজয়কৃষ্ণ নিজে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে তিনি মাকে কহিলেন, "যদি আমাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু ঘটিবে, আমি আর এই অসত্য ধারণ করিতে পারিব না।" পুত্রের এই কাতরতাতে মায়ের স্নেহ সমাজভয়ের উপরে জয়লাভ করিল। তিনি আর বিজয়কৃষ্ণকে উপবীত গ্রহণের জন্য জেদ করিলেন না, কহিলেন, "তোমাকে আর উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে না। উপবীত গ্রহণের পূর্ব্বে তোমার যে অবস্থা ছিল এখনও তোমার সেই অবস্থা হইল। আমি মনে করিব তোমার উপবীত হয় নাই।"

কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের জননী মাতৃস্নেহ-পরবশ হইয়া যাহা সহ্য করিলেন, শান্তিপুরের হিন্দুসমাজ তাহা সহ্য করিতে পারিল না। বিজয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয় সমাজের প্ররোচনায় প্রকাশ্য সভা ডাকিয়া বিজয়কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিলেন।

ইহাতেও সমাজ সন্তুষ্ট হইল না। শান্তিপুরের গোস্বামিগণ ব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন—"কেবল বাড়ী হইতে নয়, শীঘ্র ইহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দাও।" তখন সমগ্র গ্রামের সমবেত সমাজ-শক্তি বিজয়কৃষ্ণকে দণ্ড দিবার জন্য অগ্রসর হইল। এমন কি যাঁহারা সে সময়ে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাও উপবীত ধারণ ও জাতিভেদ মানিয়া চলিতেন। বিজয়কৃষ্ণের এই বাড়াবাড়ি তাঁহাদেরও ভাল লাগিল না। শান্তিপুরের ব্রাহ্ম ও হিন্দু সকলে মিলিয়া বিজয়কৃষ্ণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে তাঁহার পথে চলা কঠিন হইল। পথে বাহির হইলেই কেহ গালি দিত, কেহ তাঁহার উপরে ইট-পাটকেল ছুঁড়িত, কেহ গায়ে ধূলি দিত, কেহ পাগল বলিয়া গায়ে থুথু দিত। বিজয়কৃষ্ণ সেকালের কথা স্মরণ করিয়া একবার কহিয়াছিলেন,—"আমি যখন ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন কত লোক কত নিন্দা অপযশ ঘোষণা করিয়াছিল। গ্রামের লোকেরা এতদূর খড়্গহস্ত হইয়াছিল যে, আমাকে সমাজচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, আমাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিবার জন্য আমার গায়ে রাব-গুড় লেপিয়া বোল্‌তা লাগাইয়া দিয়াছিল।"

বিজয়কৃষ্ণ অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে এ সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন। তিনি সর্ব্বদাই কহিতেন, "সত্য আমার দিকেই আছে, আমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হই নাই। আর এই সত্য জয়যুক্তই হইবে।" গ্রামের জ্যৈষ্ঠাদিগকে তিনি কহিতেন, "আপনাদের আশীর্ব্বাদে যদি শান্তিপুরে বাস করিয়া ইহার কিছু উপকার করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সফল হয়। আমার বিশ্বাস হয়ত কালে এই ঠাকুর-ঘর ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত হইবে।"

বঙ্কুবাবু লিখিয়াছেন, বিজয়কৃষ্ণের "বিশ্বাস, বিনয় ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া কোনও কোনও ব্যক্তির হৃদয় দ্রব হইল; এবং অনেকের উত্তেজনারও লাঘব হইল; কিন্তু প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিলেন। ইহাতে তিনি নিরস্ত হইলেন না, শান্তিপুরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী রহিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার চেষ্টায় এই বৎসরই তথায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, এবং তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে তথাকার অধিবাসিগণের মনেরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।"

১৯

প্রচার ব্রতের সূচনা

মেডিক্যাল কলেজ ছাড়িয়া বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতার রাজপথে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করেন। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয় নাই। এখন যে বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজ আছে, সেই বাড়ীতেই তখন প্রেসিডেন্সি কলেজও ছিল। হিন্দু স্কুলের উত্তর দিকে যে বাড়ীতে কিছুদিন পূর্ব্বে আলবার্ট ইন্‌ষ্টিটিউট্ (Albert Institute) ছিল, সেখানেও প্রেসিডেন্সি কলেজের কোনও কোনও ক্লাস বসিত। গোঁসাই ডাক্তারি পড়া ছাড়িয়া দিয়া এই প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ এরূপভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। বিজয়কৃষ্ণ প্রাণের গভীর আবেগে এই প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। জীবের দুঃখ দেখিয়া যে মর্ম্মবেদনায় অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীভগবানের আবির্ভাবের জন্য দিবানিশি আর্ত্তনাদ করিতেন, এরূপ শোনা যায়, তাঁহার বংশধর বিজয়কৃষ্ণও সেইরূপই জীবের দুঃখ দেখিয়া সেই দুঃখ

মোচনের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া অবধি তাঁহার প্রাণে এক অভিনব ভাবের উদয় হয়। ইহার পূর্ব্বে তাহার প্রাণে শান্তি ছিল না। বেদান্ত পড়িয়া, প্রচলিত দেববাদে এবং পূজাপদ্ধতিতে আস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অথচ সংসারকেও তিনি সাধারণ লোকের মত প্রাণ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারেন নাই। প্রচলিত দেববাদ ও পূজাপদ্ধতিতে অবিশ্বাস জন্মিলেও বিজয়কৃষ্ণের স্বভাবসিদ্ধ আস্তিক্য-বুদ্ধি পূর্ব্ববৎ অটলই রহিয়া গেল। কেবল এই আস্তিক্য একটা বুদ্ধির আশ্রয় এবং পরিতৃপ্তির পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। ভক্তি হারাইয়া দেবতার ভজনা ছাড়িয়া তাঁহার প্রাণে যে অসহ্য যাতনা হইতেছিল, ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়া সে যাতনাটা নিঃশেষ নিবৃত্তি হইল। ভক্তির অভাবে দেবতার ভজনা করিতে না পারিয়া সংসারের লোকে যে যাতনা ভোগ করে, ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়া বিজয়কৃষ্ণ সেই যাতনার উপশম করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। জীবেদয়াই তাঁহার প্রচার ব্রতের মূল-প্রেরণা ছিল। এই প্রেরণাতেই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্ত্তা যে এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর তাঁহাতে বিশ্বাস, পরলোকে বিশ্বাস, বাহ্য পূজা পরিহার করিয়া আধ্যাত্মিক পূজা অভ্যাস, মানুষমাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং জাতি-ভেদ ভগবানের বিধি-বিরুদ্ধ—এ সকল মত প্রচার করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় কেশবচন্দ্রের মত বাগ্মী ছিলেন না। শব্দযোজনা করিয়া লোকের চিত্তের উপরে ইন্দ্রজাল বিস্তার করিবার দৈবীশক্তি তাঁহার ছিল না। অসাধারণ পাণ্ডিত্যও ছিল না। বিজয়কৃষ্ণের বক্তৃতা বা উপদেশে কোনও দিন কোনও প্রকারের বাক্‌চাতুর্য্য প্রকাশিত হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাণের ভাবগুলি সহজ

প্রাণের ভাষায় প্রচার করিতেন। এইজন্য যখন তিনি পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রাণের আবেগে ধর্ম্মকথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার এই স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চারি পাঁচশত লোক পর্য্যন্ত মন্ত্র-মুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা শুনিত। এই রাজপথে যে প্রচার-ব্রতের সূচনা হয়, সেই প্রচার-ব্রতের ভিতর দিয়াই বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রবর্ত্তকের ও সাধকের অবস্থা অতিবাহিত করেন।

বিজয়কৃষ্ণ লোক-সংগ্রহের জন্য ধর্ম্মপ্রচার করিতেন না। ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ ছিল। সাধনের দুই অঙ্গ, এক অন্তরঙ্গ এবং অপর বহিরঙ্গ। সকল ধর্ম্মেই এ কথা কহে। ধ্যান, ধারণা, জপ, এই সকল ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধন। উচ্চৈঃস্বরে স্তব স্তোত্রপাট, সংকীর্ত্তন, সাধক-গোষ্ঠী সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সদালাপ ও ধর্ম্মালোচনা, যাগ-যজ্ঞাদি এবং লোকসেবা, এ সকলই ধর্ম্মের বহিরঙ্গ-সাধন। ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া বিজয়কৃষ্ণ ধর্ম্মের এই উভয় অঙ্গ সাধনেই প্রবৃত্ত হয়েন। সে সময়ে ব্রাহ্মেরা অনেকে কেবল সপ্তাহান্তে সমাজে যাইয়া শাস্ত্রপাঠ, সঙ্গীত এবং মহর্ষির সুললিত সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়া নিজেদের ধর্ম্ম-জীবনের সকল কর্ত্তব্য শেষ হইল, এরূপ মনে করিতেন। অল্প লোকেই প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিয়া অবধি নিত্য ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করেন। এই উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে বিবেক-বৈরাগ্যাদিও অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। তবে তাঁহার বৈরাগ্য সহজ বৈরাগ্য ছিল, মর্কট-বৈরাগ্য ছিল না। ভোগকে ভোগ বলিয়াই তিনি গায়ে পড়িয়া বর্জ্জন করেন নাই। নিজের লক্ষ্য সাধনের প্রয়োজনেই ভোগকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। চিত্তের বিশুদ্ধতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, নিজের স্বাধীনতা

রক্ষার জন্য আবশ্যক বোধ করিলে সংসারের ভোগ বা শরীরের আয়াসের প্রতি তিনি কখনও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। অন্যথা সংসারকে ধর্ম্ম-লাভের অন্তরায়বোধে কখনও অকারণে উপেক্ষাও করিতেন না। ধর্ম্মপ্রচার বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মের বহিরঙ্গ সাধন ছিল। লোককে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া তিনি নিজের মুখে সে কথা শুনিতেন; লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিতে গিয়া নিজেই সকলের আগে নিজেকে সে উপদেশ দিতেন। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা, এই দুই অঙ্গে যেমন জ্ঞানের বা বিদ্যার সাধন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্যক্তিগত সাধন এবং ধর্ম্মপ্রচার এই দুই পথে গোস্বামী মহাশয়ের প্রথম বয়সের ধর্ম্ম-জীবন গড়িয়া উঠে। তিনি নিজের মুক্তির উপায়রূপেই প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। এই কথাটা না বুঝিলে গোস্বামী মহাশয়ের ব্রাহ্ম-সমাজের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের মাহাত্ম্য বোঝা অসাধ্য হইবে।

(২০)

ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা

ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতে আরম্ভ করিবার পরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মগণের আলাপ-পরিচয় হয় নাই। তিনি নিয়মমত কলিকাতা-সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাতে যাইতেন, আর নিজের বাসায় প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা করিতেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস অনুযায়ী নিজের জীবন ও চরিত্রকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। মাঝে-মাঝে স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শিবনাথ প্রভৃতি তাঁহার সংস্কৃত কলেজের ব্রাহ্মভাবাপন্ন সতীর্থদের সঙ্গে মিলিয়া উপাসনাও করিতেন, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মগণের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ

আলাপ পরিচয় ছিল না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন মহর্ষির সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে একদল নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকও ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনের জন্য একটা মণ্ডলী গড়িয়া তুলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সভার 'সঙ্গত-সভা' নাম রাখেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় এই 'সঙ্গত সভাই' নবীন ব্রাহ্মগণের ধর্ম্মজীবনের প্রধান উৎস হইয়া উঠে। কেশবচন্দ্রই এই 'সঙ্গত-সভার' প্রতিষ্ঠাতা। একদিন জোড়াসাঁকোস্থ পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ জয়গোপাল সেন ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহোদয়দিগের উণ্টাডিঙ্গিস্থ উদ্যানে সকলে গমন করেন। উদ্যানে গিয়া সকলকে এক একখণ্ড নূতন গামছা ও নূতন বস্ত্র প্রদান করা হইল। সকলে স্নান করিলে ব্রহ্মোপাসনান্তে প্রীতিভোজন হইল। সেই সভায় স্থির হইল যে চরিত্র-গঠনার্থ একটি ভ্রাতৃ-সভা স্থাপিত হউক, যাহাতে সকলে আপন আপন অভাবের কথা বলিবেন এবং তন্মোচনার্থ উপায় উদ্ভাবিত হইবে। "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পাঞ্জাব প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া গুরু নানকের অপৌত্তলিক ও উচ্চতর ভক্তিধর্ম্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। শিখদিগের ধর্ম্মালোচনার ও ধর্ম্ম-প্রসঙ্গের সভার নাম 'সঙ্গত-সভা'। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবিত সভার নাম তদনুকরণে 'সঙ্গত-সভা' বলিয়া নামকরণ করিলেন।

প্রথমে তিনটী সঙ্গত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দুইটীর অস্তিত্ব লোপপ্রাপ্ত হয় এবং কেশবচন্দ্রের কলুটোলার বাড়ীতে যে সঙ্গত-সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাই কেবল বাঁচিয়া রহে তাহা নহে, দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সপ্তাহে একদিন করিয়া এই সভার অধিবেশন হইত। এই সভায় কেবল যে ধর্ম্মবিষয়েরই প্রসঙ্গ

হইত তাহা নহে, নানা প্রকার কথোপকথন হইত। উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, সরস কৌতুক, পরিবার সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা, বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনা এবং কখনও কখনও রাজনীতি সম্বন্ধীয় কথা-বার্ত্তা মুক্তভাবে হইত। 'সঙ্গত-সভায়' স্বাভাবিকভাবে নানা প্রকারের ধর্ম্মালাপ হইত। বিনয়, বিশ্বাস, ভ্রাতৃভাব, উপাসনা, মানুষের কর্ত্তব্য, বিবেক, জাতিভেদ ও জাতিভেদসূচক উপবীত রাখা উচিত কি না, জীবনের উদ্দেশ্য, সময়ের ব্যবহার, ব্যায়াম, ক্ষমা, জীবনের নিয়তি (mission), সংসারের সম্বন্ধে, মৃত্যু ও নবজীবন প্রভৃতি কথোপকথনের বিষয় ছিল। নীতি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তাই অধিক এবং উহা এইভাবে হইত, যাহাতে সভ্যগণ সে সমস্ত আলোচিত বিষয় জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া পরীক্ষিত বিষয় সকল পর বারের সভায় বলিতে পারেন। সে সময়ে নীতির প্রতি সকলের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সভায় যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইত, তাহাই সভ্যদিগের চিত্ত ও জীবনকে সমস্ত সপ্তাহ আন্দোলিত করিত।"

এই সঙ্গত-সভাতেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের প্রথম পরিচয় হয়। বিজয়কৃষ্ণ একদিন সঙ্গত-সভার বার্ষিক অধিবেশনে গমন করেন। সেখানে সঙ্গত-সভা হইতে প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক একখানি পুস্তিকা তাঁহার হাতে পড়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। এই পুস্তিকার এক স্থানে লেখা ছিল—"উপবীত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" যখন মহর্ষি এই লেখাটী পাঠ করিলেন, অমনি আপনার উপবীতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তবে আর ইহা কেন?"—এই বলিয়া উপবীত ত্যাগ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায়—"উপনয়নের সময় উপবীত গ্রহণ করিবে না" এই কথা পড়িয়া সঙ্গত-সভাকে নিজের

ধর্ম্মজীবনের আদর্শের অনুকূল মনে করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। একজন পূর্ব্ববঙ্গবাসী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া সঙ্গত-সভায় গমন করিলেন ও তাহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। এইখানেই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। বিজয়কৃষ্ণ লিখিয়াছেন ঃ—

"সঙ্গতেই অধিকাংশ ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদের সহিত পরিচিত হইয়া ব্রাহ্ম-ভ্রাতাদের সহবাসে যে কি অসীম আনন্দ ভোগ করিতাম তাহা স্মরণ করিয়াও এখন হৃদয় আনন্দিত হয়। সঙ্গত এবং ব্রাহ্মসমাজ হইতে আসিয়াই মনে হইত আবার কখন সঙ্গতে গমন করিব, সমাজে গমন করিব, ব্রাহ্মভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইব। তখন আমি প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের নিকট অপরিচিত ছিলাম। এজন্য তাঁহাদের বাড়ীতে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে কোনও অনুষ্ঠান হইলে আমাকে নিমন্ত্রণ করিতেন না। কিন্তু আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই বলিয়া আমি অভিমান করিয়া বাসায় থাকিতে পারিতাম না। সেখানে ব্রহ্ম নাম শ্রবণ করিব, ভ্রাতাদের সহিত সম্মিলিত হইব, এই ভাবিয়া সর্ব্বত্রই গমন করিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতাম। ধর্ম্মজীবনের এই বাল্য ব্যবহার জীবনে না থাকিলে অভিমানে মন সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত থাকে। ভ্রাতাদিগের সহিত সরল ব্যবহার করা যায় না। তখন প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বোধ হইত। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত সামান্য উপদেশও বহুমূল্য বলিয়া বোধ হইত। ভ্রাতাদের মুখশ্রী আনন্দমাখা বোধ হইত।"

২৯

বিজয়কৃষ্ণ ও ব্রাহ্ম-সমাজের সাধন ভজন

প্রবর্ত্তাবস্থায় বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত সাধন ভজন অবলম্বন করিয়াই নিজের ধর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের সাধন ভজন কালবশে অনেক স্থলে সত্য আন্তরিকতা হারাইয়া মৌখিক কথাতে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য আজিকার যুগের বহু লোকের এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচলিত সাধনের দ্বারা উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মজীবন লাভ করা একেবারেই অসম্ভব। আন্তরিকতা হারাইলে সকল সাধন পক্ষেই এই বিপত্তি উপস্থিত হয়। এ বিষয়ে হিন্দু-সাধক বা ব্রাহ্ম-সমাজের সাধনের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু এক সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের এই সাধন ভজনের মধ্যেই সত্য আন্তরিকতা জাগিয়াছিল। সেই সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনাদি নিশ্চল হয় নাই। বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ প্রভৃতি সর্ব্বজনপূজ্য ব্রাহ্মসাধকেরা এই সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই নিজেদের জীবনে যথাসম্ভব সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এ কথা ভুলিয়া গেলেও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির ধর্ম্ম-জীবনের সঙ্কেতটী ধরিতে পারা যাইবে না।

ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় সিদ্ধিলাভের পরে একদিন আমায় কহিয়াছিলেন যে সর্ব্বেন্দ্রিয় চেষ্টার একান্ত নিবৃত্তি না হইলে সত্য ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব হয় না। তখন তিনি মৌনাবস্থায় ছিলেন। উপাসনা কি করিয়া করিতে হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম এই কথাটী লিখিয়া দিয়াছিলেন। তার নীচেই লেখেন যে, যতদিন এই যোগ অভ্যাস

না হয়, ততদিন স্বাধ্যায়, নাম জপ, সঙ্কীর্ত্তন ও সাধুসঙ্গ করিবে। এই পথে ক্রমে সত্য ব্রহ্মোপাসনার অধিকার লাভ করা যাইবে। এইখানেই গোস্বামী মহাশয়ের প্রবর্ত্তকাবস্থার সাধনভজনের ইতিহাসটী পাওয়া যায়।

স্বাধ্যায় অর্থ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রাদিপাঠ। ব্রাহ্মসমাজের রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই এই স্বাধ্যায় বা শাস্ত্রপাঠ সাধন ভজনের একটা মুখ্য অঙ্গরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন—প্রতি বাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনা করিবে, এই বিধান দিয়া গিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই প্রণালীর ব্রহ্মোপাসনাই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থে যে উপাসনার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক স্বাধ্যায়ের নামান্তর মাত্র। আদি ব্রাহ্মসমাজে শাস্ত্র অবলম্বনে ব্রহ্মের চিন্তা এবং ধ্যানই ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ উপাসনা মানস উপাসনা। এই উপাসনার ফলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট হয়।

ফলতঃ এই উপাসনা বৈদান্তিক ব্রহ্মোপাসনারই একটা আকার ভেদ মাত্র। বৈদান্তিক ব্রহ্মোপাসনার দুইটী ক্রম আছে। এক ব্যতিরেকী, অপর অন্বয়ী। ব্যতিরেকী পন্থাতে 'নেতি নেতি' সূত্র অবলম্বন করিয়া নির্গুণ অর্থাৎ জগদাতীত ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করিতে হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহা ব্রহ্ম নহে। অনুমান উপমানের দ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাও ব্রহ্ম নহে। এইভাবে সমুদায় বিষয়-জগৎকে মন হইতে দূর করিয়া দিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব, বাক্য ও মনের অতীত, এই ধারণা লাভ করিতে হয়। ইহাই ব্যতিরেকী পথ। কিন্তু এ পথে সকল সমস্যার মীমাংসা হয় না। জ্ঞানও পরিতৃপ্তি লাভ করে না, ভক্তিও চরিতার্থ হইতে পারে না। এইজন্য অন্বয়ী পথে

ব্রহ্মোপাসনা আবশ্যক হয়। ব্যতিরেকী পথে যে নির্গুণের প্রতিষ্ঠা হয়, অন্বয়ী পথে সেই নির্গুণ বা জগদাতীত তত্ত্বই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হন। এইজন্যই আমাদের মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ব্রহ্ম-স্তোত্রে কহিয়াছেন।

নির্গুণায় নমস্তুভ্যম্ বিশ্বরূপাত্মকায়তে

তুমি নির্গুণ অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান, জগতের অতীত, তোমাকে নমস্কার করি। আবার তুমিই এই বিশ্বের আত্মারূপে তাহার মধ্যে রহিয়াছ, তুমি বিশ্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি।

রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা এই দুই প্রাচীন পথ ধরিয়া চলিয়াছিল। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে এই উপাসনা-পদ্ধতিও প্রাচীনই বটে; প্রাচীনের সঙ্গে একটু আধটু তফাৎ থাকিলেও নিতান্ত অর্ব্বাচীন নহে। মহর্ষির নেতৃত্বাধীনে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এই উপাসনাই প্রচলিত ছিল। গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া এই উপাসনাই অবলম্বন করেন।

কেশববাবুর নেতৃত্বাধীনেও ব্রাহ্মসমাজে এই উপাসনা প্রণালীর কোনও মৌলিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। রাজা রামমোহন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উভয়েই প্রাচীন ঋষি-বাক্যের সাহায্যে ব্রহ্মোপাসনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজে শাস্ত্রপাঠ হইত, সাধকেরা নিজ নিজ মনে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতেন। ব্রাহ্মসঙ্গীত হইত এবং ধর্ম্মবিষয়ে আচার্য্য উপদেশ দিতেন বা ধর্ম্মতত্ত্বের বাখ্যা করিতেন। কেশবচন্দ্র পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনা করিয়া তাঁহার আরাধনা করাও ব্রহ্মোপসনায় অঙ্গীভূত করিয়া লন। শাস্ত্রবাক্য আবৃত্তি করিয়া উপাসনার একটা দোষ এই দাঁড়াইয়া যায় যে, তাহাতে উপাসক অনেক সময় কেবল টিয়াপাখীর মত কতকগুলি শ্লোকই উচ্চারণ করিয়া যান, কিন্তু তাহা দ্বারা দেবতার উপলব্ধি হয় না। কেশবচন্দ্র যে আরাধনা-

পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন তাহার ফলে প্রথম প্রথম উপাসকদিগের অন্তরে অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস হইতে আরম্ভ করে। কেশবচন্দ্রের অলৌকিক বাগ্মিতা শক্তির প্রভাবে তাঁহার আরাধনাতে উপাসকদিগের চিত্তকে একেবারে অভিভূত করিয়া তুলিত। সেকালের ব্রাহ্মদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, এক একদিনের আরাধনার নেশা সারা সপ্তাহে তাহাদিগের দেহ, মন প্রাণকে বিভোর করিয়া রাখিত। সিদ্ধবাক্ বক্তামাত্রেই শ্রোতৃবর্গের অন্তরে স্বল্পবিস্তর শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকেন। এই শক্তি-সঞ্চারকেই আধুনিক য়ুরোপীয় মনস্তত্ত্বে হিপ্‌নটিজম্ hypnotism কহে। এই শক্তিসঞ্চারের ফলে মানুষ নিমেষে দেবতা হইয়া উঠে। অতি নিকৃষ্ট লোকেও উচ্চতম আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করিয়া আপনার প্রকৃতিগত নীচতাকে ভুলিয়া যায়। এই শক্তিসঞ্চারের ফলে কেশবচন্দ্রের আরাধনার দ্বারা সে সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিত। এই আরাধনার আর একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, ইহা প্রত্যেক সাধকের ব্যক্তিগত জীবনের অতি অন্তরঙ্গ ভাবগুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দিত। শাস্ত্রাবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনাতে সর্ব্বদা ইহা সম্ভব হইত না। কেশবচন্দ্র এই আরাধনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে একটা অপূর্ব্ব আন্তরিকতা আনিয়া দেন। এই আন্তরিকতাই সেকালের ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনার বিশেষত্ব ছিল। আর এই আন্তরিকতার গুণেই বিজয়কৃষ্ণ, অঘোর-নাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের সাধকেরা নিজ নিজ সাধনায় এতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্রের যে অধিকার ছিল, সকলের ত সে অধিকার নাই!, নিজের বাক্‌শক্তির প্রভাবে কেশবচন্দ্র নিজেও যেমন মাতিতেন, অপরকেও সেইরূপ মাতাইতে পারিতেন। বিধাতা সকলকে এই শক্তি দেন না।

সুতরাং তাঁহার প্রবর্ত্তিত মৌখিক আরাধনার ফলে সেকালের ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসকেরা নিজেদের ধর্ম্মজীবন গঠনে যতটা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী কালে তাহা সম্ভব হয় নাই, আর এই নিষ্ফলতা দেখিয়াই আজকালিকার অনেক লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে জীবনের যে অংশ কাটাইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সাধন ভজন যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সকলই বিফলে গিয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণ যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, সে সময়ে দেশের লোকে হিন্দুধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বিশেষ কিছু জানিতেন না বলিলেই হয়। বিবেক, বৈরাগ্য, মুমুক্ষুত্ব ও শমদমাদি সাধন সম্পত্তি ক্বচিৎ কোন বিরল সাধকের জানা থাকিলেও সাধারণের নিকটে অজ্ঞাত ছিল। আমরা এখন দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, প্রভৃতির কথা সকলের মুখেই শুনিতে পাই, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কেহই এ সকল কথা জানিত না, আর এসকল কথার অন্তরালে যে ভাব ও বস্তু লুকাইয়া আছে, তাহারও সন্ধান পাইত না। ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধন সাধারণের মধ্যে একেবারেই লোপ পাইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজে আচার বিচার খুবই প্রচলিত ছিল। সাধারণ হিন্দুগণ এই প্রচলিত আচার বিচারকেই একমাত্র ধর্ম্মসাধন বলিয়া অনুসরণ করিতেন; কিন্তু এ সকল আচার বিচারের মূল লক্ষ্য যে দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি অতি অল্প লোকেই ইহা জানিতেন বা বুঝিতেন। যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে, ইহাতেই ধর্ম্মরক্ষা পাইবে। এই ভাবটাই সর্ব্বত্র প্রবল ছিল। সুতরাং সে সময়ে নব্য শিক্ষিত সমাজে যাহাদের মধ্যে একটা গভীর ধর্ম্মজিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আজকালকার শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনার ফলে শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের কথা শুনিয়াছেন। এই শোনা কথার উপরে নির্ভর করিয়া অনেকেরই এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, অক্ষরে অক্ষরে প্রাচীন সাধন-পন্থার অনুবর্ত্তন না করিলে কিছুতেই সত্য ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তিলাভ হয় না, বা হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ যে সাধন-পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে আমাদের স্বদেশের সনাতন সাধন পথ নহে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের সেই সনাতন সাধন-পথেও যে সিদ্ধিলাভ হইত তাহাও চিরকালই অত্যন্ত বিরল ছিল। সকল সাধনেই সিদ্ধিলাভ অত্যন্ত বিরল। আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের সাধনেও যে অতি অল্প লোকেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন, ইহাও কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ প্রথম জীবনে যে ব্রাহ্মসমাজের সাধন-পথ ধরিয়া চলিয়াছেন সে পথে যে দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনের সার্ব্বজনীন বনিয়াদ গড়িয়া উঠে নাই, বা উঠিতে পারে না, একথাও সত্য নহে।

দেহশুদ্ধি নির্ভর করে খাদ্যখাদ্যাদি বিচারের উপর। দেহশুদ্ধির অর্থ—'ধাতুর প্রসন্নতা লাভ' উপনিষদ কহিয়াছেন।

'ধাতু প্রসাদাৎ মহিমানমাত্মানম্'

ধাতু প্রসন্ন হইলেই আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। এই ধাতুর প্রসন্নতাকেই দেহশুদ্ধি কহে। এই ধাতুর প্রসন্নতা স্নায়ু-মণ্ডলের স্থৈর্য্যের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। মন সংযমাদি, অন্তরঙ্গ সাধন সম্পত্তি স্নায়ুমণ্ডলের স্বাস্থ্য, শক্তি এবং স্থৈর্য্যের উপর নির্ভর করে। বহুকাল হইতে এই দেশে এই জন্য প্রাণায়াম দেহশুদ্ধি বা ধাতুর প্রসন্নতালাভের একটা অতি প্রশস্ত পন্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট

হইয়াছে। যাঁহারা প্রাণায়াম অভ্যাস করেন তাঁহারা এই প্রাণায়ামের সহায় বলিয়া খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়া চলেন। যাহা খাইলে বা পান করিলে স্নায়ুমণ্ডল চঞ্চল হইয়া উঠে ও নিজের ধারণা-শক্তি হারাইয়া বসে, তাহাতে প্রাণায়াম প্রক্রিয়ার গুরুতর ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়। এইজন্য প্রাণায়াম যাঁহারা অভ্যাস করেন তাঁহাদিগকে খাদ্যাখাদ্য বিচার করিয়া চলিতে হয়। প্রাণায়াম যাঁহারা অভ্যাস করেন না, তাঁহাদিগের পক্ষেও ধাতুর প্রসন্নতা কিম্বা দেহশুদ্ধি লাভ করিবার জন্য খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়া চলিতে হয়। এই বিচারের উদ্দেশ্য—স্নায়ুমণ্ডলকে প্রকৃতিস্থ রাখা। ছুঁৎমার্গ অবলম্বন না করিয়াও, এই দিক্ দিয়া খাদ্যাখাদ্যের বিচার সম্ভব হয়।

বিজয়কৃষ্ণ যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তখন ব্রাহ্ম সাধকেরা দেশ-প্রচলিত ছুঁৎমার্গ বর্জ্জন করিয়াও খাদ্যাখাদ্য বিচার করিয়া চলিতেন। সে-কালের অধিকাংশ ব্রাহ্মই নিরামিষাশী ছিলেন। মদ্যপান ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে প্রচলিত ছিল বটে; কিন্তু বিজয়-কৃষ্ণের প্রবর্ত্তাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজে কোন প্রকারের মাদক দ্রব্য সেবন করা মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত হয়। মদ্যপান ত দূরের কথা, ধূমপান করিলেও তখনকার ব্রাহ্মসমাজে 'জাতি যাইত'। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের সাধনাতে যে দেহশুদ্ধির কোনও ব্যবস্থা ছিল না, এমন নহে। প্রথম যুগের ব্রাহ্মেরা জীবনের সকল কর্ম্মকেই ধর্ম্মের অধীন করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। আহারাদি সম্বন্ধেও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিতেন। শরীরে শক্তি ও স্বাস্থ্যবিধান করাই আহারের ধর্ম্মসঙ্গত উদ্দেশ্য, কেবল রসনার পরিতৃপ্তি নহে। যে কেবল রসনার তৃপ্তির জন্য ভোজন করে, তাহার ধর্ম্মহানি হয়। যাহা খাইলে শরীরের শক্তি ও স্বাস্থ্য নষ্ট হয় তাহা খাওয়া পাপ, প্রথম যুগের ব্রাহ্মদিগের অনেকেরই

এই ধারণা ছিল। এই ভাবে তখনকার ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-সাধনের মধ্যে দেহশুদ্ধিরও ব্যবস্থা ছিল।

সে কালের ব্রাহ্ম সাধকেরা একেবারে যে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন না, এমন নহে। যোগপথে প্রাণায়ামের একটা বিশেষ প্রণালী আছে। ব্রাহ্মসমাজের সাধনে এই প্রণালীর প্রাণায়াম কখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু যোগাসনে বসিয়া পূরক, ধারণ ও নিষ্কুম্ভক না করিয়াও, সঙ্গীত-সঙ্কীর্ত্তনাদির সাহায্যে প্রাণায়ামের ক্রিয়া ও ফল হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের মধ্যে কোনও দিন প্রাণায়াম প্রচলিত হয় নাই। যোগী সন্ন্যাসীরাই ইহা রীতিমত অভ্যাস করিতেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ধর্ম্ম-সাধনকে সহজ ও সার্ব্বজনীন করিবার উদ্দেশ্যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করেন। এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা সাধারণ বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে অজ্ঞাতসারে প্রাণায়ামের ক্রিয়া হয়। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই বৈষ্ণব সাধকদিগের দেহশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজে সকল উপাসকই প্রতিদিন উপাসনার সময়ে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এই সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন নির্জ্জন ও সজন উভয় উপাসনারই অঙ্গ ছিল। যাঁহারা গাহিতে পারিতেন না, তাঁহারাও নিজ নিজ সাধন-ভজন সময়ে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। সামাজিক উপাসনা-কালেও উপাসক-মণ্ডলীর প্রায় প্রত্যেক সভ্যই সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। এইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস না করিয়াও যেমন সাধারণ বৈষ্ণব-মণ্ডলীর মধ্যে, সেইরূপ ব্রাহ্ম-উপাসকদিগের মধ্যেও তাঁহাদের অজ্ঞাত-সারে প্রাণায়ামের ক্রিয়া চলিত। সুতরাং দেহশুদ্ধির এই প্রাচীন পন্থা যে ব্রাহ্মসমাজে একেবারে প্রচলিত হয় নাই, এইরূপ বলা যায় না। গোস্বামী মহাশয় নিজে গাহিতে পারিতেন। তিনিই ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ব্রজগোপাল

গোস্বামী একজন সুগায়ক ছিলেন। শান্তিপুরে বিজয়কৃষ্ণ আশৈশব বৈষ্ণব-কীর্ত্তন উপভোগ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া সঙ্গীতাচার্য্য বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ইমন-ধ্রুপদাদি সঙ্গীতে মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু প্রাণে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করেন নাই। সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি অন্তরের টান হ্রাস হওয়া দূরে থাক, ধর্ম্মজীবনে তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই সে টান বাড়িতে আরম্ভ করে। কেশবচন্দ্রের হৃদয়ে ভক্তিভাব সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিলে, বৈষ্ণব সাধনের দিকেও তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ক্রমে খোল-করতাল-যোগে সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ জন্মে। আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্ম-দিগের অন্তরে বৈষ্ণব সঙ্কীর্ত্তনের উপরে একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত আদি-ব্রাহ্মসমাজ খোল-করতালের ধ্বনি সহিতে পারিতেন না। এখন রবীন্দ্রবাবু সেখানেও খোল করতাল যোগে ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু এক সময়ে আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের ত কথাই নাই, কেশবচন্দ্রের সহচর ও অনুচরেরা পর্য্যন্ত এ সকল বৈষ্ণব ভাবের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ এই তিন জনে মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজে বৈষ্ণব ভাবের সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করেন। প্রথমে ব্রাহ্ম-প্রচারকদিগের বাড়ীতে গোবিন্দদাস নামক একজন বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়াকে আনা হয়। তিনি খোল-করতাল-যোগে "প্রেম-পরশমণি শ্রীশচীনন্দন" এই কীর্ত্তনটী করেন। তাঁহার কীর্ত্তনে কেশবচন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজে খোল-করতাল-যোগে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—"গোস্বামী-সন্তান বিজয়কৃষ্ণের স্বভাবতঃ বৈষ্ণব ভাব; তিনি তৎকালে সঙ্কীর্ত্তনের প্রধান সহায় হইলেন, এবং নিম্নলিখিত দুইটী সঙ্কীর্ত্তন-গীত প্রস্তুত করিয়া

গান করিলেন। প্রথম সঙ্গীতটী গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক গীত "প্রেম-পরশমণি শ্রীশচীনন্দনের" স্থরে গ্রথিত।

"পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই,
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়া লুটাইব রে।
পতিতপাবন পিতা ভকতবৎসল,
উদ্ধারেন পাপীজনে দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি সংসার-পাথারে
পতিত দেখিয়া দয়া তাই এত হয় রে
বিলম্ব না করো আর ভুলিয়ে মায়ায়,
ত্বরিতে লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে।"

"পতিত-পাবন, ভকত-জীবন, অখিল-তারণ বল্‌রে সবাই।
বল্‌রে, বল্‌রে, বল্‌রে সবাই।
(যাঁরে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে)
(যাঁরে ডাক্‌লে পাপী তরে' যাবে)
(ওরে এমন নাম আর পাবি না রে)"

তারপর, চিত্তশুদ্ধির কথা। ব্রাহ্মসমাজের সাধনের ইতিহাস ব্রহ্ম-সঙ্গীতের ভিতরে অতি পরিস্ফুট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষির সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের সাধনে নিত্যানিত্য বিবেক জাগাইবার চেষ্টাই বেশী ছিল। রামমোহন রায়ের সময় হইতেই এই চেষ্টা আরম্ভ হয়। রাজার নিজের রচিত সঙ্গীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা জগৎ-কার্য্য দেখিয়া, জগৎকার্য্যের আলোচনা করিয়া জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তার চিন্তা ও ধ্যানের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

"স্মর পরমেশ্বরে, অনাদি কারণে
বিবেক ও বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।"

—ইহাই রাজার সাধনের মূলমন্ত্র ছিল। এই ধারাই মহর্ষির সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। কেশবচন্দ্র খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম ও মূল প্রেরণা প্রাপ্ত হন। চিত্তের ও চরিত্রের নির্ম্মলতা সাধন প্রথম হইতেই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনে মূল লক্ষ্য হইয়াছিল। এই জন্য কেশবচন্দ্রের প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে খৃষ্টিয়ান ঝাঁজের পাপ-বোধ অত্যন্ত প্রখর ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের রচিত প্রথম ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তনে, ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। সে-কালে চরিত্রের পবিত্রতা-লাভ করিবার দিকে ব্রাহ্মসমাজে অত্যন্ত প্রখর দৃষ্টি ছিল। জাতি-বর্ণ বিচার না করিয়াও চিত্তশুদ্ধির জন্য যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার প্রয়োজন, তাহা অবলম্বন করা যে সম্ভব, সে-কালের ব্রাহ্ম-সাধকেরা ইহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। সে-কালে ব্রাহ্মেরা জীবনের সকল কর্ম্মকেই ধর্ম্মের অধীন করিবার চেষ্টা করিতেন। সত্য, ন্যায় এবং মৌন সম্বন্ধে কঠোর পবিত্রতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহারা চিত্তশুদ্ধির পথে চলিয়াছিলেন। অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসারের সুখ-সুবিধা-সাধন তাঁহারা বিষবৎ বর্জ্জন করিতেন। ভোগ ও বিলাসে আসক্তি চিত্তের অশান্তি উৎপাদন করে বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আড়ম্বরশূন্য জীবন যাপন করিতেন। সে-কালের শিক্ষিত সমাজ অত্যন্ত সাদা-মাটা ভাবে চলিতেন। কেশ-বিন্যাসের পারিপাট্য ছিল না, অথচ মাথার চুলও উষ্ক-খুষ্ক থাকিত না, জামায় গলার বোতাম থাকিত না। যাঁরা গোঁপ দাড়ি কামাইতেন না, মোটা সাদা ধুতি এবং অনেক সময়ে মোটা মার্কিণের চাদর পরিতেন ও চটি পায়ে বেড়াইতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজের লোক বলিয়া ধরা পড়িতেন। কি কথায়, কি

আচরণে, মিথ্যা ব্যবহার ও কপটতা বিষবৎ পরিত্যক্ত হইত। কি জানি অজ্ঞাতসারেও মিথ্যার সংস্পর্শ হয়, এই ভয়ে তখনকার ব্রাহ্মেরা কোনও কথা বলিবার সময়ে প্রায় সর্ব্বদাই "বোধ হয়" বিশেষণ ব্যবহার করিতেন। এরূপ শোনা যায়, যে, একদা একজন ব্রাহ্ম ব্যাঙ্কের হিসাব মিলাইয়া তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন, হিসাব ঠিক হইয়াছে ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'বোধ হয় ঠিক হইয়াছে।' তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী বলিলেন, 'বোধ হয় কি, ঠিক করিয়া বল।' তিনি উত্তর দিলেন, 'হাঁ, প্রায় ঠিক।' বহু নির্বন্ধসহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট হইতে 'বোধ হয়' 'সম্ভব' প্রভৃতি উত্তর বিনা আর কোনও উত্তর পাইলেন না। কালক্রমে ব্রাহ্মসমাজের সে দিন চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া এই সাধন-পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তাহার সত্য আন্তরিকতা নষ্ট হয় নাই। আর এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজের সাধন অবলম্বন করিয়াই তিনি তাঁহার চরম সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

২২

ব্রাহ্মসমাজের সাধন-ভজন

সকল ধর্ম্ম-সাধনেরই দুইটা দিক্ আছে, একটা বহিরঙ্গ ও আর একটা অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ সাধন, নামেই তার পরিচয়—সাধকের বাহিরের আচার আচরণে, কর্ম্মে অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েই অধিকাংশ লোক কলের পুতুলের মত ধর্ম্মের এ সকল বাহিরের আচার আচরণের অনুকরণ করিয়া চলে। এ সকল বহিরঙ্গ

সাধনের মূল লক্ষ্যের প্রতি অল্প লোকেই মনোযোগ দিয়া থাকে। সেই মূল লক্ষ্যটি সাধকের অন্তরের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া তাহার সত্য ধর্ম্ম-জীবন গড়িয়া তোলা। সকল সম্প্রদায়েই অতি অল্প লোকে ধর্ম্মের এই মূল লক্ষ্যটী ধরিয়া চলেন। ব্রাহ্মসমাজেও এই সাধারণ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্ম যখন ধর্ম্মের বহিরঙ্গেই নিজেদের সাধন-ভজনকে কার্য্যতঃ আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তখন বিজয়কৃষ্ণ অনন্যলক্ষ্য হইয়া এ সকল বাহিরের সাধন-ভজনের দ্বারাই তাঁর নিজের ভিতরের ধর্ম্ম-জীবনকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। এইজন্যই আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের মামুলি সাধন-প্রণালীও বিজয়কৃষ্ণের জীবনে আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছিল।

এই সাধনের সঙ্গে বস্তুতঃ আমাদের দেশের মহাজন-পন্থা প্রদর্শিত ব্রহ্ম-সাধনের যে বিশেষ প্রভেদ নাই, ইহা দেখিয়াছি। বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের প্রথম কথা নিত্যানিত্য বিবেক-জাগান। প্রাচীনেরা বেদান্তবিদ্যার অনুশীলনের দ্বারা, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা', এই সকল মন্ত্র জপ করিয়া, নিজেদের অন্তরে এই নিত্যানিত্য-বিবেক জাগাইবার চেষ্টা করিতেন। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় এই জগৎ অনিত্য। এই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় আজ আছে, কাল থাকে না। এই শরীর অনিত্য, চিতার ভস্মমুষ্টি ইহার শেষ পরিণাম। এই ইন্দ্রিয়সকল অনিত্য, জরা উপস্থিত হইলে ইহাদের বীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়; বিষয়-গ্রহণ ও বিষয়-সম্ভোগের শক্তি আর থাকে না। মৃত্যু সংসারে সকল সম্বন্ধকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিষয়ের অনিত্যতা চিন্তা ও ধ্যান করিয়া নিত্যানিত্য-বিবেক জাগাইতে হয়। ব্রহ্ম-সাধনের ইহাই প্রথম সোপান। যখন বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে আসেন, তখন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আমাদের প্রাচীন

উপনিষদের চর্চ্চা আরম্ভ হয় নাই বলিলেও চলে। রাজা রামমোহন ঈশ, কেন প্রভৃতি পাঁচখানি উপনিষদের মূল এবং বাংলা অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, সত্য। তিনি বেদান্ত-সূত্রের সার সংগ্রহ করিয়া তাহারও মূল এবং বাংলা অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। রাজা এইরূপে আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্রের উপরেই ব্রহ্ম-সভার সাধ-ভজনাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহর্ষিও উপনিষদের ভাষাতেই তাঁহার "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এইরূপে আমাদের আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের সাধনের সঙ্গে প্রাচীন বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন-পন্থার একটা যোগ বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। মহর্ষির সময় পর্য্যন্ত এই যোগটা প্রকাশ্যভাবেই কিয়ৎপরিমাণে রক্ষিত হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সময়ে এই যোগ অনেকটা ভাঙ্গিয়া যায়। কেশবচন্দ্র শ্রুতি অবলম্বনে ব্রহ্মোপসনার পদ্ধতি বদলাইয়া দেন। তিনি মৌখিক আরাধনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

এই শ্রুতিগুলি মাত্র তাঁহার উপসনাতে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রহ্ম-সাধনে এইটুকু মাত্র প্রাচীনের সঙ্গে যোগ রক্ষিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন এবং পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্রাদির পাঠ তাঁহাদের উপাসনার অঙ্গ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র জগতের সকল ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতিতে এই সকল শ্লোকের পাঠ প্রবর্ত্তিত করেন। তারপর কেশবচন্দ্রের সহচরেরা এবং অনুচরেরা সকলেই

ইংরাজী শিক্ষিত ছিলেন। দেশের প্রাচীন সাধন-পন্থার জ্ঞানও তাঁহাদের ছিল না, তাহার প্রতি কোন শ্রদ্ধাও তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং প্রাচীন ব্রহ্ম-সাধকেরা যে উপায়ে নিত্যানিত্য-বিবেক সাধন করিতেন, আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের তাহা অবলম্বিত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাধনের মধ্যে যে নিত্যানিত্য-বিবেকের অনুশীলন হইত না, একথা বলা যায় না। সে-কালে কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ আরাধনা-সময়ে ব্রহ্ম-স্বরূপের ব্যাখ্যা করিতেন এবং এই সকল ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া এক দিকে জগতের অনিত্যতা ও অন্য দিকে ব্রহ্মের নিত্য সত্য স্বরূপ সর্ব্বদাই ফুটিয়া উঠিত। প্রাচীনেরা শ্রুতি পাঠ করিয়া কিম্বা "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা", এই মন্ত্র জপ করিয়া যে নিত্যানিত্য-বিবেক জাগাইবার চেষ্টা করিতেন, আধুনিক ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে ব্রহ্মোপাসনার ভিতর দিয়া সেই নিত্যানিত্য-বিবেক জাগাইবার চেষ্টা হইত। সুতরাং আকারের বিভিন্নতা সত্ত্বেও বস্তুতঃ এই আধুনিক ব্রহ্ম-সাধনের সঙ্গে এ বিষয়ে প্রাচীন ব্রহ্ম-সাধনের কোনও বিশেষ প্রভেদ ছিল না। তবে প্রাচীন কালেও যাঁরা বেদান্ত বিদ্যার অনুশীলন করিতেন, তাঁদের সকলের অন্তরেই নিত্যানিত্য-বিবেক জাগ্রত বা প্রতিষ্ঠিত হইত না। অধিকাংশ লোকেই যন্ত্রারূঢ়ের মত এ সকল শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন। আমাদের আধুনিক ব্রাহ্ম-সমাজেও অধিকাংশ ব্রাহ্মই সেইরূপ কেবল কথাই শুনিতেন বা আওড়াইতেন, বস্তু-লাভের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ করিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে যে ব্রহ্ম-সাধনের বনিয়াদ গড়িয়া উঠিত না, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। বিজয়কৃষ্ণের মত নিষ্ঠাবান্ ও স্বাভাবিকাস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্ম-সাধকদিগের মধ্যে এই ব্রহ্মোপাসনার দ্বারাই নিত্যানিত্য-বিবেক জাগিয়া উঠিয়াছিল, এ কথাও অস্বীকার

করা যায় না। আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের সাধনের সফলতার বা নিষ্ফলতার সাক্ষী ইহারাই। সকল ধর্ম্ম-সাধনে সিদ্ধ মহাপুরুষেরাই সে সকল সম্প্রদায়ের ও সাধনের সফলতার বা নিষ্ফলতার সাক্ষী। কোন সম্প্রদায় বা সাধনেই জনসাধারণ এ সাক্ষী দেয় না, দিতে পারে না।

বিজয়কৃষ্ণ যে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলেন এবং প্রথম জীবনে যে ব্রহ্ম-সাধনের ভিতর দিয়া তাঁহার ধর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার সত্য মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে ব্রাহ্মসমাজের সাধনের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাসটী ভাল করিয়া দেখিতে হয়। রাজা রামমোহন এই সাধনের জমি মাত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়া যান।

"স্মর পরমেশ্বরে, অনাদি কারণে
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।"

ইহাই রাজার সাধনে মূলমন্ত্র ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য হইয়া রাজার জ্ঞান-প্রধান সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির সূত্রকে গাঁথিয়া দেন। এ ভক্তি শাণ্ডিল্য-সূত্রের ভক্তি। "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—ঈশ্বরে অথবা জগতের নিয়ন্তা যিনি তাঁহাতে পরা অনুরক্তিই মহর্ষির ভক্তি-সাধনের সাধ্য ছিল। অনুরাগের উৎপত্তি লোভে, লোভের উৎপত্তি সম্ভোগে, সম্ভোগের নিদান আনন্দ। মহর্ষি, এক দিকে সেই বেদিতব্য পুরুষকে জান, যাঁহাকে জানিলে পরে মৃত্যু তোমাদিকে আর ব্যথিত করিতে পারিবে না—ব্রাহ্ম-সাধকদিগের অন্তরে এই ভাবে নিত্যানিত্য-বিবেক জাগ্রত করিবার চেষ্টা করেন। আর ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের ভজনাতে উপাসক-মণ্ডলীকে আহ্বান করেন। মহর্ষির এই মূল ভাবটি দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনও কোনও সঙ্গীতে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে।

"জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী ;
নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব অরুণজ্যোতিঃ মহিমা প্রচারে
বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়-কপাট খুলি দেখ রে যতনে
প্রেমময় মুরতি জনচিত্তহারী ;
ডাক রে নাথে বিমল প্রভাতে
পাইবে শান্তির বারি ॥"

এই সুমধুর প্রভাতী সঙ্গীতে সংক্ষেপে মহর্ষির সাধন এবং সিদ্ধির সঙ্কেতটী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—
শান্তং শিবমদ্বৈতম্

—ইহাই মহর্ষির ব্রহ্মোপসনার ও ব্রহ্ম-সাধনের মূল সূত্র ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করাই মহর্ষির ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য ছিল। মহর্ষি শঙ্কর বেদান্তের অদ্বৈত সিদ্ধান্তের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ভক্তির পরিপন্থী বলিয়া তিনি অদ্বৈত সিদ্ধান্তকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মায়াবাদী ছিলেন না, জগৎকে একান্ত মিথ্যা ভাবিতেন না। অন্য দিকে জগৎপ্রপঞ্চ যে অনিত্য, ইহাও প্রত্যক্ষ কথা। সুতরাং মায়াবাদীরা জগৎকে যেমন মিথ্যা কহেন, মহর্ষি জগৎকে সেইরূপ মিথ্যা কহিতেন না, বটে ; আবার জড়বাদ বা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষবাদ জগৎকে যে ভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, মহর্ষি তাহারও সমর্থন করিতেন না। তাঁহার নিকটে জগৎ ব্রহ্মের বিভূতি মাত্র ছিল।

"তাঁহারই আনন্দ-ধারা জগতে যেতেছে বয়ে
এস সব নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।"

ইহাই মহর্ষির ব্রহ্ম-সাধনের একটা মূল কথা ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার মুখে মহর্ষির এই সাধন-প্রত্যক্ষ সত্যটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ, ইহাই মহর্ষির ব্রহ্ম-সাধনের মূল কথা।

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের প্রথম প্রেরণা আসে বেদান্ত হইতে নহে, কিন্তু বাইবেল হইতে। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের বনিয়াদ "বিবেক"। এই বিবেক বৈদান্তিক পরিভাষার বিবেক নহে, কিন্তু খৃষ্টিয়ান পরিভাষার conscience'এর বাংলা অনুবাদ মাত্র। এই বিবেকের বা conscience'এর জন্ম হয় সাধকের পাপ-বোধে। এই পাপ-বোধই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের ধর্ম্ম-সাধনের প্রধান কথা ছিল। মহর্ষির সঙ্গ ছাড়িয়া যাইয়া কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষির সঙ্গে কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরবর্গের বিরোধ বাধে এই বিবেক বা conscience লইয়া। এই বিবাদের উপলক্ষে তিনি নিজেই কহিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের এই সংগ্রাম বিবেকের (বা conscience'এর) সংগ্রাম।

"প্রথম যুদ্ধ একেশ্বর-বাদের যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। সঙ্কীর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। পুরাতন অভ্যস্ত ভাবের সহিত নূতন নূতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন ; কিন্তু কয়েক জন সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিক ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিলে হইবে না, প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বাসানুসারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ

করিতে হইবে। দৈনিক :জীবন ব্রহ্ম-পাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে হইবে। প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইবে এবং সমস্ত জীবন দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিন্ন কোনও কার্য্য করা উচিত নহে। অতি সামান্য বিষয়েও মানুষের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে, জীবনের ক্ষুদ্রতম কার্য্যসকলও বিবেকের অনুমোদিত হওয়া উচিত।' প্রথমোক্ত ব্রহ্মবাদিগণ জীবনপথে এতদূর অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে বিবেকবাদীদিগকে তাঁহাদের দল হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘোরতর যুদ্ধ। বিধাতা পুরুষ তাঁহার অনন্ত সিংহাসনে বসিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বিবেক-পরায়ণ নব্য যুবকদলের মনে স্বর্গীয় সৎসাহস এবং দুর্ণিবার উৎসাহানল প্রজ্জলিত করিয়া দিতে লাগিলেন।

পরিশেষে বিবেক জয়লাভ করিল। বিবেকী প্রধানুরাগীর দল জীবন্তভাবে বিবেকের রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রাচীন ব্রহ্মবাদিগণ ক্রমশঃ শুষ্ক, নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, এবং কঠোর নিয়মতন্ত্র হইয়া জীবনশূন্য ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন।" কেশবচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষের অন্তরে একটা স্বাভাবিকী বৃত্তি আছে, যাহার দ্বারা সে ভালমন্দ, পাপ-পুণ্যাদি বুঝিতে পারে। ইহারই নাম তিনি বিবেক রাখেন। এই বিবেকই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রথম বনিয়াদ হয়। কেশবচন্দ্র এই বিবেকের উপরেই তাঁহার নিজের এবং তাঁহার শিষ্যগণের ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। সেই প্রথম যুগের ব্রাহ্মসমাজের সাধনের ইতিহাসে ইহা একটা মূল কথা।

এই বিবেকের প্রেরণায় ব্রাহ্ম সাধকদিগের অন্তরে একটা গভীর ও প্রখর পাপবোধ জাগিয়া উঠে। মহর্ষির উপাসনা-পদ্ধতিতে এ ভাবার্থ ফুটিয়া উঠে নাই। কেশবচন্দ্র এই ভাবটাকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত উপাসনা-প্রণালীতে মহর্ষির "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি সমাধান-সূত্রের সঙ্গে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" এই শ্রুতি-বাক্য জুড়িয়া দিলেন। মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ, যিনি আনন্দ-রূপে ও অমৃত-রূপে প্রকাশিত হইতেছেন, যিনি শান্ত-স্বরূপ, অদ্বৈত পুরুষ—এই ভাবেই ব্রহ্মের আরাধনা ও ধ্যান হইত। এই আরাধনাতে সাধকের পাপবোধকে জাগাইয়া তাহাকে পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিত না। এইজন্য কেশবচন্দ্র "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের সঙ্গে ব্রহ্মের আরাধনার মূলমন্ত্রে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" এই শ্রুতিটী জুড়িয়া দেন। ইহার ফলে, ব্রাহ্মসমাজের সাধন নিরতিশয় একাগ্রতা সহকারে চিত্তশুদ্ধির পথে চলিতে আরম্ভ করে। মহর্ষি যে আরাধনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাতে বেদান্তে যাহাকে বিবেক ও মুমুক্ষুত্ব কহিয়াছেন, তাহার অনুশীলনের সূত্রপাত হয়। কেশবচন্দ্র যে ভাবটা ব্রাহ্মসমাজের সাধন-ভজনে আনিয়া দিলেন, তাহার ফলে ব্রাহ্মদিগের চিত্তশুদ্ধি এবং শম-দমাদি সাধনসম্পত্তি-লাভের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিল। কেশবচন্দ্র যাহাকে বিবেক কহিলেন, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে তাহার বিশুদ্ধতা লাভ বা রক্ষা অসম্ভব। এই বিবেকের বিশুদ্ধতা-রক্ষার জন্য মনঃসংযম ও ইন্দ্রিয়সংযম অত্যাবশ্যক। এইরূপে কেশবচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত বিবেক-সাধনের মধ্য দিয়া একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম-সাধকেরা প্রাচীন বৈদান্তিক পরিভাষা অধ্যয়ন না করিয়াও শম-দমাদি ষট্-সম্পত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন। এইরূপে আধুনিক ব্রাহ্ম-সমাজের সাধনও প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ব্রহ্ম-সাধনের পথেই চলিয়াছিল। না চলিলে,

বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সাধকেরা যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা কখনও সম্ভব হইত না। ব্রাহ্মসমাজে গোস্বামী মহাশয় নিজের ধর্ম্ম-জীবনের ও ধর্ম্ম-সাধনের যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেগুলি উপেক্ষার বস্তু নহে। তিনি কখনও নিজে এগুলিকে উপেক্ষা করেন নাই। বরং সর্ব্বদাই সিদ্ধি-লাভের পরেও অকৃত্রিম আন্তরিকতা সহকারে ব্রাহ্মসমাজের নিকটে তাঁহার কৃতজ্ঞতার কথা প্রচার করিতেন।

গোস্বামী মহাশয় সিদ্ধি-লাভের পরেও সর্ব্বদাই কহিতেন যে, বীর্য্যধারণ ও সত্যরক্ষা, এই দুইটিই সত্য ধর্ম্ম-জীবনের মূল। বীর্য্য-ধারণকেই আমাদের প্রাচীনেরা ব্রহ্মচর্য্য কহিতেন। এই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা "ধাতুর প্রসন্নতা" লাভ করা যায়। উপনিষৎ কহিয়াছেন—"ধাতুপ্রসাদাৎ মহিমানমাত্মানং"—ধাতুর প্রসন্নতা-লাভ হইলেই আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ হয়। ব্রহ্ম-সাধনের চরম লক্ষ্য—ব্রহ্মদর্শন। ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণ ব্যতিরেকে সত্য ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব; গোস্বামী মহাশয়ের মুখে বারংবার এ কথা শোনা গিয়াছে। স্বচ্ছ কাচখণ্ডের পশ্চাতে পারার পুট লাগাইলেই যেমন সে কাচ আয়না হয় এবং তাহার উপরে বিবিধ বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতি-ফলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণের দ্বারা মানুষের বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয়ের পশ্চাতে সেই শক্তি জাগিয়া উঠে, যাহার ফলে এ সকলের উপরে ব্রহ্ম-সত্তার প্রতিবিম্ব প্রতি ফলিত হইয়া বিশ্বকে ব্রহ্মময় করিয়া তোলে। এইজন্যই ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণ সকল ধর্ম্ম-সাধনের মূল। এই বীর্য্যধারণের দ্বারাই দেহশুদ্ধি লাভ হয়। সেইরূপ সত্যরক্ষা চিত্তশুদ্ধি-লাভের উপায়। বীর্য্যধারণ ব্যতীত যেমন দেহশুদ্ধি লাভ অসাধ্য, সেইরূপ সত্যরক্ষা

ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি-লাভ অসাধ্য। এইজন্যই বীর্য্যধারণ এবং সত্যরক্ষা ধর্ম্ম-জীবনের পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। গোস্বামী মহাশয় এবং সে-কালের ব্রাহ্ম যুবকেরা প্রাণপণে সত্যরক্ষা এবং বীর্য্য-ধারণের অভ্যাস করিতেন। সত্যের প্রতি সে যুগের ব্রাহ্মদিগের কি গভীর অনুরাগ ছিল, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সে-কালেও নবীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে গোস্বামী মহাশয়ের মত সত্যানুরাগী পুরুষ অতি অল্পই ছিলেন—একথা ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্ববাদিসম্মত। আর যৌন সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের দেহ-মনের বিশুদ্ধতাও ব্রাহ্মসমাজে আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছিল। তিনি কেবল বাহিরের আচরণে নহে, মনের নিগূঢ়তম চিন্তাতেও যাহাতে কোনও পাপ-কলুষ স্পর্শ না করে, সে বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। আর এইজন্যই তাঁহার মত বিশুদ্ধ-চরিত্র সাধকও ধর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় পাপবোধে প্রপীড়িত হইয়াছিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট পাপপুণ্যের একটা বিশেষ কষ্টিপাথর ছিল। সে কষ্টিপাথর অন্তরের অনাবিল শান্তি এবং ভগবানের পূজা-আরাধনাতে প্রাণের আত্যন্তিক আগ্রহ ও পূজা-আরাধনার সরসতা। যখনই অন্তরের শান্তি নষ্ট হইয়া যাইত, যখনই উপাসনা মিষ্ট লাগিত না, ভগবচ্চিন্তায় ও ভগবানের নামে ঈষন্মাত্র অরুচি দেখা যাইত, তখনই বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে গভীর যাতনা উপস্থিত হইত। এমন কেন হইল, এই ভাবিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন এবং পাপ ব্যতিরেকে মানুষ ঈশ্বরের কৃপা হইতে কখনও বঞ্চিত হয় না, এই বিশ্বাসের প্রেরণায় তাঁহার ভিতরে অবশ্যই কোনও পাপ লুকাইয়া আছে মনে করিয়া অত্যন্ত কাতর হইতেন। এই কাতরতা তাঁহার রচিত

সে-কালের ব্রহ্ম-সঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে। অন্তরের এই শুষ্কতায় অবস্থাতেই তিনি গাহিয়াছিলেন—

মূলতান—আড়া

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় ?
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণ সম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপেরই সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।
এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে' কেশে ধরে', দাও চরণে আশ্রয়॥

সে-কালে বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে কি তীব্র পাপবোধ ছিল, একটী ঘটনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। একবার তিনি কুস্বপ্ন দেখিয়া জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন, সে কাহিনী যথাসময়ে ও যথাস্থানে কহিব। ব্রাহ্ম-জীবনের প্রথম অবস্থায় বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচলিত সাধনের ভিতর দিয়াই কি পরিমাণে যে দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ-স্বরূপই এখানে এ কথাটার উল্লেখ করিলাম। বিজয়কৃষ্ণ প্রথম জীবনে যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়েন, ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তখনকার সেই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মজীবনের বিচার করিতে গেলে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িতে হইবে—বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস আমাদিগকে এ কথাটাও মনে করাইয়া দেয়।

ধর্ম্মপ্রচার ও কর্ম্মযোগ

কর্ম্মের ভিতর দিয়া ভগবানের যে পূজা হয়, তাহাই সত্য কর্ম্মযোগ। গোস্বামী মহাশয় যে-কালে ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করেন, তখন এই কর্ম্মযোগও ব্রাহ্মদিগের সাধনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। রাজা রামমোহন মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে—

"ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত, তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইয়া যে-কোনও কর্ম্মেই নিযুক্ত হইবেন, তাহাই ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন—এই শ্লোক উদ্ধার করিয়া ব্রহ্ম-সভার সভ্যদিগকে এই কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছিলেন। তারপর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজার ব্রহ্ম-সভার পুনরুদ্ধার করিয়া তাহার নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হইলে—"তস্মিন্ প্রীতিঃ, তৎপ্রিয়-কার্য্যসাধনং তদুপাসনামেব" —অর্থাৎ পরব্রহ্মে প্রীতি অর্পণ করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনই ব্রহ্মের উপাসনা—এই উপদেশ দিয়া নূতন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কর্ম্মযোগ প্রচার করেন। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের সাধনের মধ্যে প্রথম হইতেই কর্ম্মযোগের একটা ধারা চলিয়া আসিয়াছিল।

কর্ম্মযোগের মূল লক্ষ্য—চিত্তশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি। মানুষকে আপনার জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য নিয়তই নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হয়। লোকে সচরাচর আপনার ভোগবিলাস-সাধনের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাকে। মানুষের সুখ এবং ভোগের উপকরণ যাহা আছে তাহা রাখিবার জন্য এবং যাহা নাই তাহার সংগ্রহার্থে সে এ সংসারে যাবতীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এ সকল কর্ম্ম করিতে যাইয়া এক দিকে তাহার ভোগ-লিপ্সা এবং অন্য দিকে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান সর্ব্বদাই বাড়িয়া উঠে।

এই কারণে মানুষের কর্ম্ম তাহার বন্ধনেরই হেতু হয়, মুক্তির সহায় এবং সাধন হইতে পারে না। অথচ কর্ম্ম ছাড়িয়া মানুষ থাকিতেও পারে না। কর্ম্মত্যাগে শরীরযাত্রা পর্য্যন্ত অসাধ্য হইয়া উঠে। অন্য দিকে, কর্ম্ম করিতে যাইয়া সে আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া পড়ে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া সাধকেরা যে উপায়ে এই কর্ম্ম মানুষের বন্ধনের হেতু না হইয়া বরং তাহার মুক্তিরই সহায় হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মানুষ সচরাচর নিজের প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ক্ষুন্নিবারণের জন্য সে খাদ্য সংগ্রহ করে; রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে শরীরটাকে বাঁচাইবার জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, শীত-কষ্ট-নিবারণের জন্য বস্ত্রাদি সংগ্রহ করে; যৌন-প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে। আবার সন্তানাদি জন্মিলে, তাহাদের প্রতি সহজ স্নেহপরবশ হইয়া তাহাদের ভরণপোষণের জন্য অশেষ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে। এই ভাবে মানুষ প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া সর্ব্বদাই কর্ম্ম করিতেছে। প্রাকৃত অবস্থায় এ সকল কর্ম্ম করিতে যাইয়া সে কোন প্রকারের যম-নিয়মাদি মানে না। সে ক্ষুধা পাইলেই খায়, অপরাপর উত্তেজনা হইলেই তাহার তৃপ্তি-সাধনের জন্য দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া যায়। এ সকল প্রবৃত্তিকে সংযত না করিলে, দশ জনে মিলিয়া সমাজ বাঁধিয়া থাকা সম্ভব হয় না। সমাজস্থিতি-রক্ষার জন্য সর্ব্বদাই মানুষের প্রবৃত্তিকে বিধিনিষেধ দিয়া বাঁধিতে হয়। এ সকল বিধিনিষেধই ধর্ম্মের প্রথম বনীয়াদ। সেই বিধিনিষেধের শাসনের দ্বারাই মানুষ সর্ব্বপ্রথমে পশুত্বের ভূমি হইতে উঠিয়া মানবতার সোপানে আরোহণ করে। এই বিধিনিষেধের দ্বারা সমাজ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়। এ সকলের সাহায্যে মানুষ ইন্দ্রিয়-সংযম শিক্ষা করে বটে; কিন্তু আত্মশুদ্ধি লাভ

করিতে পারে না। এই সমাজ-ধর্ম্মের সাহায্যে মানুষের যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়-ভোগের চেষ্টা চারিদিকে বাধা পাইয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে অনেকটা সংযত করিয়া আনে। কিন্তু এই সমাজ-ধর্ম্মের দ্বারা প্রকৃত আত্মশুদ্ধি হয় না।

এই সমাজ-ধর্ম্মকেই ইংরাজীতে morality (মরালিটি) কহে। এই সমাজ-ধর্ম্মে আর আমাদের দেশে যাহাকে মোক্ষ-ধর্ম্ম কহে তাহার মধ্যে আকাশ-জমিন প্রভেদ। এই কথাটা ভাল করিয়া না বুঝিলে, আমাদের সাধনে যাহাকে কর্ম্মযোগ কহে তাহার মর্ম্ম-গ্রহণ সম্ভব হয় না। সমাজ-ধর্ম্ম মানুষের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকেই কেবল কিয়ৎ পরিমাণে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহার আত্মা বা চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারে না। আত্মা অশুদ্ধ হয় প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মের দ্বারা নহে, কিন্তু কর্ম্ম করিতে যাইয়া জীবের মধ্যে যে কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠে, তাহারই দ্বারা। আর সমাজ-ধর্ম্মের বা morality-র অনুসরণ করিয়া অনেক সময়ে মানুষের অহঙ্কার এবং কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধিটাই প্রবল হইয়া উঠে। যে যত এই সমাজ-ধর্ম্মে বা morality-তে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অনেক সময়ে সে আপনাকে তত ধার্ম্মিক এবং শক্তিশালী বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই morality বা সমাজ-ধর্ম্মের আশ্রয়ে সত্য কর্ম্মযোগ-সাধন হয় না। মানুষের কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি বা অহং-বুদ্ধি নষ্ট করাই কর্ম্মযোগের সাধ্য। ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরবিশ্বাসের উপরেই সত্য কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিশ্বাসের উপরেই আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই ভিত্তির উপরেই গোস্বামী মহাশয়ের কর্ম্ম-যোগ প্রথমে গড়িয়া উঠে।

বেদান্ত পড়িয়া তাঁহার অন্তরে প্রথমে যখন 'অহং ব্রহ্ম' এই অভি-মান জাগিয়া উঠিয়াছিল, তখন তাঁহার এই কর্ম্মযোগের আরম্ভ হয় নাই।

এই অদ্বৈত ব্রহ্ম-বাদ প্রকৃতপক্ষে একমাত্র জীবের অজ্ঞানতাকেই অধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীর চক্ষে ইহা ছাড়া ধর্ম্মা-ধর্ম্মের আর কোনও প্রভেদ থাকে না, থাকিতেই পারে না। কারণ, এই অদ্বৈত ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় দ্বৈত-বুদ্ধিমাত্রই "অবিদ্যাবৎ বিষয়ানি।" যত দিন বিজয়কৃষ্ণ অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের মোহে পড়িয়াছিলেন, তত দিন সাধন-ভজনের কোনও প্রয়োজনই অনুভব করেন নাই। শুষ্ক জ্ঞানের মরু-প্রান্তরে পড়িয়াই তাঁহার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। যে দিন ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া পরমেশ্বরের ভজনায় অর্থাৎ ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তন এবং ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণে অভূতপূর্ব্ব শান্তি ও আরাম পাইলেন, সে দিন হইতেই তাঁহার সত্য ধর্ম্মজীবন বা আধ্যাত্ম জীবনের আরম্ভ হয়। 'তিনিই ব্রহ্ম', এ মোহ কাটিয়া গেল। ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক; ব্রহ্ম প্রভূ, জীব তাঁর দাস—ব্রহ্মের উপাসনা জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য; এই উপাসনার দ্বারাই জীবের মুক্তি বা পরমার্থ-লাভ হয়; এই প্রতীতি জন্মিয়া তাঁহাকে সাধন-ভজনে প্রবর্ত্তিত করিল। এই যে দাসাভিমান, ইহার উপরেই তখন হইতে বিজয়কৃষ্ণের অন্তর্জ্জীবন গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইহারই উপরে তাঁহার কর্ম্মসাধন ও কর্ম্মযোগের প্রতিষ্ঠা হয়।

এখন হইতেই গোঁসাই যেমন নিয়মিত ভাবে তিন বার পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন, সেইরূপ তাহারই সঙ্গে তাঁহার ইষ্টদেবতার মুখ চাহিয়া জীবনের সকল কর্ম্মকে নিয়মিত করিতে আরম্ভ করিলেন। শরীর-ধারণ আবশ্যক প্রভুর সেবার জন্য। সুতরাং শরীরের শক্তি এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন আহার-বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি সাধারণ জীব-ধর্ম্মের অনুসরণ করা পরমেশ্বরের উপাসনার অন্তর্গত হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বেই গোস্বামী মহাশয়

সংসার পাতিয়াছিলেন। এই সংসার পরমেশ্বরেরই বিধান, সৃষ্টি-রক্ষার জন্য এই সংসারের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং তাঁহারই আদেশে, তাঁহারই কার্য্য-সাধনের জন্য মানুষকে সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়। পরিবারের সেবাও তখন বিজয়কৃষ্ণের সাধনের অঙ্গ হইয়া গেল। ধর্ম্ম-জীবনের প্রথমাবধিই তিনি নিজেকে আপনার পরিবারের কর্ত্তা বলিয়া ভাবেন নাই। যে সংসার তিনি পাতিয়াছিলেন, তাহার উপরে সর্ব্বপ্রকারে অহং-বুদ্ধি এবং মমত্ব-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ নিষ্কাম-ভাবে পরিবার-পরিজনের প্রতিপালন আরম্ভ করিলেন। সংসারের কর্ত্তা যখন তিনি নহেন, তখন সংসারের ভাবনাই বা তিনি ভাবিবেন কেন? এই ভাবে সমুদয় ভার পরমেশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ নিষ্কাম কর্ম্মপথে চলিতে আরম্ভ করেন।

সংসারে অনটন তখন প্রায় লাগিয়াই ছিল। পৈতৃক গুরু-ব্যবসায় গোঁসাই তখন ছাড়িয়া দিয়াছেন। মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়া স্বাধীন-ভাবে জীবিকোপার্জ্জনের আশায় তিনি ডাক্তারী শিখিতেছিলেন। সে শিক্ষাও শেষ হইল না। ডাক্তারী যাহা তিনি শিখিয়াছিলেন, তাহাতেই এ ব্যবসায় চলিতে পারিত। কিন্তু তাঁহার অন্তরের ধর্ম্মবুদ্ধি তাহারও অন্তরায় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ব্রহ্মোপাসনাতে তিনি প্রাণের মধ্যে যে অনুপম শান্তি ও আনন্দ পাইয়াছিলেন, জগতের সকল লোককে সে সৌভাগ্যের অংশীদার করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন এবং এই ধর্ম্ম ও সাধন বিলাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া অন্য সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তারী করিয়া অর্থোপার্জ্জন অসম্ভব হইল। সুতরাং এ সময়ে তাঁহাকে একান্ত-ভাবে আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই জীবনযাত্রা এবং সংসারধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইত। এ সময়ে কত দিন তাঁহাকে সপরিবারে

অর্দ্ধাশনে বা অনশনে দিন কাটাইতে হইত। কোনও দিন এমনও ঘটিয়াছে, যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কাদা-জল পর্য্যন্ত তাঁহাকে খাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এ সকল কিছুতেই বিজয়কৃষ্ণকে তাঁহার জীবনব্রত হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই।

নূতন ব্রাহ্মগণ শিখদিগের সুহৃদ্-গোষ্ঠীর অনুকরণে সঙ্গত-সভার প্রতিষ্ঠা করেন, এ কথার উল্লেখ করিয়াছি। এই সঙ্গত-সভা হইতেই বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রচার-ব্রতগ্রহণের প্রেরণা আসে। তখনও মেডিক্যাল কলেজে তাঁহার নাম রহিয়াছে। পড়া ছাড়িবেন শুনিয়া তাঁহার বন্ধুরা কেহ কেহ বলিলেন—"মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আর অধিক বিলম্ব নাই। এ সময়ে পড়া ছাড়িলে তোমার পরিবার কিরূপে প্রতিপালিত হইবে?" কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে সে ভাবনা জাগিল না। বন্ধুদের কথা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল—যিনি মরুভূমিতে তৃণ গুল্ম রক্ষা করেন, সমুদ্রের গভীর-নীর-মধ্যে প্রাণিপুঞ্জকে প্রতিপালন করিতেছেন, তিনি কখনও অনাহারে দুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন না। এই ভাবিয়া, ভগবচ্চরণে সকল ভার অর্পণ করিয়া গোঁসাই প্রচার-ব্রত-গ্রহণে অগ্রসর হইলেন।

গোঁসাই নিজে লিখিয়াছেন ঃ—

"১৭৮৪ শকের (১২৬৯ সন, ইংরাজী ১৮৬২) শেষভাগে একদিন সঙ্গতে এইরূপ আলোচনা হইয়াছিল যে, এখন নানা দেশবিদেশের লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে গমন করিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উপদেশ দেন, এরূপ লোকের নিতান্ত অভাব। ইহা শ্রবণ করিয়া আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখনই বলিলাম, আমি প্রচার-ব্রত অবলম্বন করিব। সঙ্গতস্থ সকলেই আনন্দের সহিত আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভক্তিভাজন আচার্য্য

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন যে, 'ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রচারক হইতে হইলে রীতিমত পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে, এরূপ নিয়ম করা হইয়াছে।' আমি ঐ পরীক্ষা দিতে সম্মত হইলাম। আরও দুইটি ভ্রাতা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় বহু পরিশ্রমের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পরে আদেশ হইল যে, প্রথম হইতে সমস্ত তত্ত্ব-বোধিনী পাঠ করিতে হইবে। প্রায় দুই মাস পরিশ্রম করিয়া তত্ত্ব-বোধিনীও পাঠ করিলাম। তাহার পর আচার্য্য মহাশয় প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি করেন। আমি শ্রীরামপুরে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে প্রচারক বলিয়া স্বীকার করিয়া গ্রহণ করেন; এবং প্রথমেই কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের ভার প্রদান করেন। প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিকট সংস্কৃত 'ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম' পুস্তক অধ্যয়ন করিতে আদেশ করেন। তাঁহার নিকট 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' পুস্তক পাঠ করি।"

মানুষ সচরাচর কার্য্য করে সহজ প্রবৃত্তির প্রেরণায়। এই সকল সহজ প্রবৃত্তি মানুষের যেমন আছে, ইতর জন্তুদিগেরও সেইরূপ আছে। যতক্ষণ এক মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে অপর মানুষের প্রবৃত্তির বিরোধ না বাধে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ সকল সহজ কর্ম্মে ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা উঠে না। এই জন্য শিশুদিগের কর্ম্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার চলে না। শিশুরা কর্ম্ম-রাজ্যে ইতর জন্তুদিগেরই সমান। ইতর জন্তুদিগের মত ইহারা ক্ষুৎপিপাসাদির তাড়নাতেই চলে। ক্রমে মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহার সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে সমাজের অপর লোকের প্রবৃত্তির এবং এই সকল প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য তাহাদের যথাযোগ্য সত্ব-স্বাধীনতার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়া উঠে, এবং এই বিরোধ হইতেই সমাজস্থিতি-রক্ষার জন্য সমাজ-ধর্ম্মের বা morality-র প্রতিষ্ঠা আরব্ধ হয়। এই

সমাজ-ধর্ম্ম মানুষকে বিবিধ বিধিনিষেধাদির দ্বারা বাঁধিয়া নিবৃত্তির পথে পরিচালিত করে, তখন মানুষ আর কেবল নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলে না বা চলিতে পারে না। এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্য ব্রতোপাসনাদিরও ব্যবস্থা হয়। এই সঙ্গেই যাগযজ্ঞাদিরও প্রতিষ্ঠা আরব্ধ হয়। সমাজের অভিব্যক্তির এই সোপানে এই যাগ-যজ্ঞাদি ও ব্রতনিয়মাদি কর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে কর্ম্ম বলিতে মোটের উপর যাগযজ্ঞাদিই বুঝাইত। মানুষ সহজ প্রবৃত্তির প্রেরণায় যে সকল কর্ম্ম করিত, তাহা কর্ম্ম বলিয়াই পরিগণিত হইত না। যে কর্ম্মের দ্বারা মানুষের সহজ প্রবৃত্তি নিয়মিত ও সংযত হইত, তাহাই কর্ম্ম বা ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইত। ক্রমে যমনিয়মাদি এবং যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। এক সকাম, অপর নিষ্কাম। যজ্ঞফল-লোভে যাহা অনুষ্ঠিত হইত, তাহাকেই সকাম কর্ম্ম বলা হইত। কিন্তু কেবল বিহিত বলিয়া ফলাভিসন্ধি-বিরহিত হইয়া যে যজ্ঞাদি বা ব্রতনিয়মাদি অনুষ্ঠিত হইত, তাহাকেই নিষ্কাম বলা হইত। এই নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় প্রকৃতপক্ষে ভক্তি-সাধনে। ইষ্টদেবতায় যে অনুরাগ, তাহাই ভক্তির মূল। ধর্ম্ম যত দিন ধার্ম্মিকের অন্তরের লোভ বা ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তত দিন তাহাতে ভক্তি জাগে না। দেবতায় অনুরাগ জন্মিয়া সেই অনুরাগের প্রেরণায় যখন মানুষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার ধর্ম্ম ভক্তির দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই ভক্তির প্রেরণা যখন জাগে, তখন মানুষ কেবল বিহিত বলিয়া নহে, কিন্তু দেবতাপ্রীতিকাম হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। তখন হইতেই তাহার নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা আরব্ধ হয়। স্বর্গাদির ফললোভে আর তখন সে যজ্ঞাদি করে না। আর কেবল শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বলিয়াই সে

এ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহাও নহে। কেবল বিহিত বলিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় তাহার অন্তরালে লোভ নাই বটে; প্রত্যক্ষ কোনও ভয় নাই, এ কথাও মানিতেই হইবে। তবে বিহিত বলিয়া ইষ্টানিষ্ট বিচার-বিরহিত হইয়া এ কর্ম্ম করি কেন? এ প্রশ্নটা উঠে। ইহার এক উত্তর এই সম্ভব, যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহা ভাঙ্গিতে চাহি না বলিয়া। এই জাতীয় কর্ম্ম তামসিক হইতে পারে। আবার ইহাও সম্ভব, সমষ্টিগত সমাজ-শক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ ও বিহিত বলিয়াই অন্য সর্ব্ব প্রকারের ভাব-বিরহিত হইয়া মানুষ এ সকল কর্ম্ম করিতে পারে। এখানেও কর্ম্ম নিষ্কামের সোপানে আরোহণ করে না; সকাম ও নিষ্কামের মাঝখানে আটকাইয়া থাকে। কর্ম্ম যখন ইষ্ট-দেবতার প্রীতি-কামনার দ্বারা প্রেরিত হয়, তখনই কেবল তাহা সত্য-ভাবে নিষ্কামের পর্য্যায়ে যাইয়া উঠে। নিষ্কাম অর্থে এখানে অকাম নহে, আত্মকামও নহে; কিন্তু যাহা দেবতার প্রীতি-কামনায় অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের প্রাচীন ক্রিয়াকলাপ কতকগুলি সকাম এবং কতকগুলি ঈশ্বরপ্রীতিকাম, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমান পূজাপার্ব্বণাদিও এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া আছে।

ইহা ছাড়া কর্ম্মের আর এক প্রকারের বিভাগও আছে। কতকগুলি কর্ম্মকে নিত্য আর কতকগুলিকে নৈমিত্তিকও বলা হইয়াছে। আর বিশেষ বিশেষ তিথিতে যে সমুদায় পূজাপার্ব্বণের অনুষ্ঠান হয়, তাহা নৈমিত্তিক। নৈমিত্তিক কর্ম্ম প্রায় অনেকগুলিই সকাম। নিত্য কর্ম্মগুলি করিতেই হয়, না করিলে প্রত্যবায় আছে। নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্বন্ধে এ কথা খাটে না; করিতে পারিলে ভাল, না করিলে প্রত্যবায় নাই। নিত্য-কর্ম্মের উদ্দেশ্য—দেহশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধি। নিত্য-কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মজীবনের বনীয়াদ গড়িয়া উঠে। অর্থাৎ মানুষ সাধারণ

পশুত্বের ভূমি হইতে উঠিয়া বিশিষ্ট মানবতার ভূমিতে যাইবার যোগ্যতা লাভ করে। এই জন্যই নিত্য-কর্ম্ম অবশ্য-কর্ত্তব্য। কিন্তু এই নিত্য-কর্ম্মও ইষ্টদেবতার প্রীতিকামনায় অনুষ্ঠিত হইতে পারে। স্নানাহারাদি নিত্য-কর্ম্ম এ অবস্থায় ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া করিলে, যজ্ঞাদির পর্য্যায়ভুক্ত হয়।

"যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

এই ভাবে, অর্থাৎ "যখন যাহা কর্ম্ম করিবে, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে," অথবা "হে অর্জ্জুন, তুমি যে যজ্ঞ কর, যে দান কর, যাহা ভোজন কর, তৎসমুদয় আমাকে অর্পণ কর"—গীতার এই উপদেশানুযায়ী জীবনের যাবতীয় কর্ম্ম সাধন করিলে তাহাও নিষ্কাম-পর্য্যায়ভুক্ত হয়। তখন ভোজনে আর ভজনে কোনও পার্থক্য রহে না। ইহাও কর্ম্মযোগের পথ। এ পথেও নিষ্কাম কর্ম্মে সিদ্ধি-লাভ সম্ভব। এই ভাবেই নিত্যকর্ম্মগুলি সাধন করিতে হয়।

গোস্বামী মহাশয় যখন প্রথম ব্রাহ্মসমাজে আসেন, তখন নবীন ব্রাহ্মেরা এই পথেই কর্ম্মযোগ সাধন করিবার চেষ্টা করিতেন। প্রতিদিনের নিয়মিত নির্জ্জন উপাসনা বা ঈশ্বর-চিন্তা এবং পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণা ব্যতীত তাঁহারা জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতেন। এমন কি, স্নানাহারের সময়েও তাঁহারা পরমেশ্বরের সান্নিধ্য এবং কৃপা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন।

পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে সর্ব্বদা ব্রহ্মোপাসনা হইত। আর সে উপাসনা মৌখিক উপাসনা ছিল না। তাহার মধ্যে অনেক সময়ে অত্যন্ত গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ পাইত। এবং এই আন্তরিকতা-নিবন্ধন সে-কালের ব্রাহ্মদিগের নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি সত্য-ভাবে

কর্ম্মযোগ-সাধনের সহায় হইয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া এ সকলের ভিতর দিয়াই প্রথম কর্ম্মযোগের পথে চলিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাই এই পথের শেষ কথা নহে। লোক-শ্রেয়ঃই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। রাজা রামমোহন বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি বর্জ্জন করিয়া এই লোক-শ্রেয়ঃকেই কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং কর্ম্মযোগের প্রশস্ততম পথ বলিয়া প্রচার করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিতে এই লোকশ্রেয়ঃকেও বিশেষ-ভাবে বুঝিতেন। সংসারের ভাল যাহাতে হয়, লোকের কল্যাণ যাহাতে হয়, অজ্ঞানকে জ্ঞানদান, ক্ষুধিতকে অন্নদান, সংসারতাপে জর্জ্জরিত যাহারা তাহাদিগকে শান্তির পথ দেখাইয়া দেওয়া, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা প্রদান করা—এক কথায়, মানুষের দুঃখ যাহাতে যায়, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনুষ্যত্ব যাহাতে ফুটিয়া উঠে, তৎসমুদায়ই ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য। এ সকলই লোকশ্রেয়ের অন্তর্গত। এ সকলই ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মযোগের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠে। এই পথেই প্রথম যুগের ব্রাহ্মেরা কর্ম্মযোগ-সাধনের চেষ্টা করিতেন। এই ভাবের প্রেরণাতেই বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-ব্রত গ্রহণ করেন।

ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মসাধন

১৭৮৭ শকাব্দে (ইং ১৮৬৫ সালে) মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—এই দুই জনকে ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য পদে বরণ করেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণের অভিষেক-উপলক্ষে তাঁহাকে এই উপদেশ দেন :—

"সৌম্য, তুমি অন্ত ঈশ্বর-প্রসাদে উপাচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হইলে। তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান উপার্জ্জনে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে, এবং সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে তাহা বিতরণ করিবে। অধ্যয়ন অধ্যাপনে ও গৃহধর্ম্ম-যাজনে সর্ব্বদা নিরলস হইবে। নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে পবিত্র হইয়া পবিত্র-স্বরূপের সহবাসে আনন্দ উপভোগ করিবে। এবং সতুপদেশ ও সাধু চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরের পথে সকলের মনকে আকর্ষণ করিবে। গুরুজনকে ভক্তি করিবে। বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে ও সকলকে যথোপযুক্ত সম্মান দিবে। স্বাধীন হইয়াও বিনয়ী হইবে। পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবে। কাহারও প্রতি দ্বেষ করিবে না। অন্যে যদি তোমার প্রতি অসাধু ব্যবহার করে, তুমি সাধুভাব অবলম্বন করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিবে। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবে না, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবে। সম্পদে বিপদে, স্তুতি-নিন্দায়, মানে-অপমানে অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, অভিপ্রায় মহান্ হউক, হৃদয় পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুময় হউক। তোমার চক্ষু ভদ্র রূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্র কথা শ্রবণ করুক।"

সে-কালে ব্রাহ্মসমাজে প্রচার-ব্রতের কি আদর্শ ছিল, মহর্ষির এই সংক্ষিপ্ত উপদেশের মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তখনকার ব্রাহ্মসমাজের সাধন জ্ঞানপ্রধান ছিল। মহর্ষি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত বিবিধ জ্ঞানের আলোচনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। মহর্ষি বিজয়কৃষ্ণকে ধর্ম্মোপদেষ্টার পদে বরণ করিতে যাইয়া এই আদর্শটা উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার নিকট ধরিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণও সিদ্ধিলাভের পরে পর্য্যন্ত সর্ব্বদা জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন। জ্ঞানচর্চ্চা তাঁহার জীবনব্যাপী ধর্ম্ম

সাধনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। ইহার ভিতরকার কথাটা এই ছিল যে, গোঁসাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়া কোনও দিন আপনার অন্তরে যাহা সুদৃঢ়-রূপে ধরিতেন না, কখনই অপরকে তাহার সম্বন্ধে কোনও উপদেশ দিতেন না। আর এই জন্যই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কি ব্রাহ্মসমাজে কি ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছিল।

ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে অনেক বিপদ্ আছে। অত্যন্ত সচকিত হইয়া না চলিলে, ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া প্রচারকের আত্মাভিমান এবং ধর্ম্মাভিমান বাড়িয়া উঠিতে পারে এবং সে অবস্থায় ধর্ম্মপ্রচারের আশ্রয়ে সত্য কর্ম্মযোগ সাধন করা সম্ভব হয় না। বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে এরূপ আত্মাভিমান বা ধর্ম্মাভিমান কোনও দিন তিলার্দ্ধ পরিমাণেও স্থান পায় নাই। আর ইহার মূল কারণ এই ছিল যে, বিজয়কৃষ্ণ কোনও দিন অপরকে উদ্ধার করিবার জন্য ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। অপরের মুক্তি বিধান করিবার জন্য নহে, কিন্তু নিজের উদ্ধার-সাধনের জন্যই নিতান্ত মুমুক্ষু হইয়া বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সূচনাবধি এই প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দশ জনকে লইয়া ব্রহ্মোপাসনা করা, বক্তৃতা এবং উপদেশ দিয়া লোকের অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ করা এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করাই চিরদিন আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মপ্রচারের অঙ্গ হইয়া আছে। সামাজিক উপাসনা ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনের একটা প্রধান অঙ্গ। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য প্রচারকেরা এই সামাজিক উপাসনার সাহায্যে একই সঙ্গে নিজেদের ধর্ম্মসাধন এবং দশ জনের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। এখানে সাধন এবং প্রচার এক হইয়া আছে। সামাজিক উপাসনায় আচার্য্য ভগবৎ-স্বরূপের চিন্তা ও ধ্যান করেন।

এই চিন্তা ও ধ্যান নীরব চিন্তা ও ধ্যান নহে। ইহার বাহন—উপযোগী বাক্য। ইহার প্রাণ—অন্তরের অনুভূতি বা উপলব্ধি। যেখানে এই অনুভূতি বা উপলব্ধি আগে হয় এবং প্রকাশ্য বাক্য অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভবকে যথাসম্ভব ব্যক্ত করে, ব্যক্ত করিতে যাইয়াই সেই অনুভবকে আরও সুস্পষ্ট করিয়া তুলে ও সেই অনুভব হইতে অন্তরে যে রসের উদয় হয় সেই রস বা ভাবকে গভীরতর করিয়া তুলে, সেখানেই কেবল এই বাঙ্ময়ী উপাসনা আপনার সম্যক্ সফলতা লাভ করে। অনুভব যেখানে আদিতে, ভাব যেখানে অগ্রে চলে, বাক্য যেখানে নিজের অক্ষমতা অনুভব করিয়া অতি সন্তর্পণে এই অনুভব এবং ভাবকে নিজের উপলব্ধি এবং সম্ভোগের জন্য নিজের নিকট ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে, সেখানে এই উপাসনা যুগপৎ আচার্য্যের ধর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলে এবং উপাসকমণ্ডলীর অন্তরে ভগবদ্ভাব জাগাইয়া তাহাদের চিত্তকে ভগবন্মুখী করিয়া দেয়। কিন্তু এইরূপ সামাজিক উপাসনা অতি বিরল। এরূপ উপাসনার অধিকারী আচার্য্যও বিরল। আর এই উপাসনায় যোগ দিয়া আপনাদের অন্তরের নীরব ধর্ম্ম-পিপাসার দ্বারা আচার্য্যের ধর্ম্ম-ভাবে শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন, এরূপ উপাসকমণ্ডলীও অত্যন্ত বিরল। এই জন্য আমাদের ব্রাহ্মসমাজের মামুলী উপাসনায় এই আদর্শটী অতি অল্পই ফুটিয়া উঠে। সামাজিক উপাসনা এই জন্য অনেক সময়ে অত্যন্ত বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে এবং অসংযত বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়। বিজয়কৃষ্ণ যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-রূপে ব্রাহ্ম উপাসকদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপসনা করিতেন, তখন তাঁহার উপাসনায় কোনও দিন এই বহির্ম্মুখী ভাব বা বাগাড়ম্বরের লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়

নাই। গোঁসাই কি উপাসনায়, কি সঙ্গীত-সঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই অত্যন্ত সচকিত থাকিতেন। এমন দেখা গিয়াছে যে, সঙ্গীত বা সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, গোঁসাই মৃদঙ্গের তালে তালে করতাল বাজাইতেছেন। হঠাৎ সঙ্গীত বা সঙ্কীর্ত্তনের মাঝখানে আর করতাল বাজে না। গোঁসাই চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছেন, মুখে ভাবের লেশমাত্র নাই। আবার খানিক পরে করতাল বাজিতে লাগিল। দেখা গেল, গোঁসাইয়ের শুষ্ক প্রাণে ভাবের বান ডাকিয়াছে। মুখ ভাবে ডগমগ, চোখ ভাবাবেশে ঢুলু-ঢুলু হইয়া আসিয়াছে। তখন বোঝা গেল, কেনই বা করতাল মাঝখানে বন্ধ হইয়াছিল এবং আবার বাজিতে আরম্ভ করিল। করতাল বাজাইবার সময়েও বিজয়কৃষ্ণ সর্ব্বদা অতি সচকিত হইয়া অন্তরের ভাবের সঙ্গে বাহিরের কর্ম্মের যোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। ভিতরে ভাব শুকাইয়া গেলে, বাহিরে কোনও প্রকারের ধর্ম্মানুষ্ঠান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভাব শুকাইলে গোঁসাই যতক্ষণ না তাহা আবার বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, ততক্ষণ প্রাণের মধ্যে অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিতেন; এবং কি করিলে আবার শুকনো গাঙে বান ডাকে, তাহার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেন। এমনটী আর ব্রাহ্মসমাজে দেখা যায় নাই।

একদিনের কথা মনে পড়ে। আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম কি না মনে নাই। কিন্তু ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের মুখে এ কাহিনী অনেক বার শুনিয়াছি। সে সময়ে কোন্নগরে খ্যাতনামা ব্রাহ্ম শ্রেষ্ঠী স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয় বাঁচিয়াছিলেন। শিবচন্দ্র বাবুর জীবদ্দশায় এবং তাঁহার পরলোক-গমনের পরেও তাঁহার পুত্র সত্যপ্রিয় দেব মহাশয়ের জীবন-কালে, ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিনে সমারোহ-সহকারে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বাৎসরিক উৎসব হইত। বালী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতির

লোকেরা এই উৎসবকে শিবচন্দ্রবাবুর একটা পারিবারিক উৎসবের মত ভাবিতেন; এবং ব্রাহ্মসমাজের সভ্য না হইয়াও, তাঁহারা সামাজিক-ভাবে দেব মহাশয়ের এই উৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন শিবচন্দ্র-বাবুর বৃহৎ পরিবার পরিজন। কলিকাতার অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা ছিল। শিবচন্দ্রবাবুর ব্রাহ্ম হইবার পূর্ব্বে ইঁহারা যেমন দুর্গোৎসবাদি উপলক্ষে তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন, সেই ভাবে ইঁহারা কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের এই উৎসবে আসিয়া যোগ দিতেন। এই উৎসবোপলক্ষে এক কালে শিবচন্দ্রবাবুর বাড়ীতে এবং কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে বহু লোকের সমাগম হইত।

একবার কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সায়ংকালীন উপাসনার ভার গোস্বামীর মহাশয়ের উপর অর্পিত হয়। তাঁহার নামে তাঁহার উপাসনা শুনিবার জন্য কলিকাতা হইতে অনেক ধর্ম্মপিপাসু ব্রাহ্ম এবং কোন্নগর ও নিকটবর্ত্তী স্থানের বহুতর উদারমতি হিন্দুতে ব্রাহ্ম-মন্দির পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু কাল পূর্ব্বে গোঁসাই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার ঘাটে যাইয়া বসিলেন। বোধ হয়, প্রকৃতির মধ্যে পরমেশ্বরের উপলব্ধি করিয়া প্রাণের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী ভাবের উদ্বোধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ভাব আসিল না। উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত। গোঁসাই তখনও ঘাটেই বসিয়া আছেন। সঙ্গীত আরম্ভ হইল। কিন্তু গোঁসাই ঘাট ছাড়িয়া আসিলেন না। তাঁহাকে ডাকিতে লোক গেল। মন্দির লোকারণ্য হইয়াছে। উপাসকমণ্ডলী তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। লোকের উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে। গোঁসাই শুনিয়া কহিলেন, আমার দ্বারা আজ উপাসনার কাজ হইবে না; অপর কাহাকেও বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতে বলুন। কিন্তু এ লোকারণ্য যে তাঁহারই উপাসনা শুনিবার

জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে! তথাপি গোঁসাই সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কার উপাসনা শুনিতে কে আসে? যে উপাসনা করিবে, সেই যে এখনও জাগে নাই। গোঁসাই ত নিজে উপাসনা করিতেন না। যে আবেশে তিনি উপাসনা করিতেন, সে আবেশ যতক্ষণ না হইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে দশ জনকে লইয়া ভগবানের আরাধনা করা সম্ভব ছিল না। উপাসনা সম্বন্ধে তিনি বাহিরের কোনও বিধি বিধান মানিতেন না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণের মধ্যে আরাধ্য দেবতার অনুভব না জাগিয়াছে, ততক্ষণ তিনি কথার ডালি সাজাইয়া কোনও দিন আরাধনার অভিনয় করেন নাই।

মনে হয়, এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—অন্তরে ভাব না আসিলে বাহিরে বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু ভাব ত আয়ত্তাধীন নয়, তার খুসি-মত কালে-ভদ্রে সে আসে, এ অবস্থায় ত কেবল কালে-ভদ্রেই ভগবানের আরাধনা করিতে হয়, প্রতি দিনের উপাসনা তাহা হইলে আর হয় না—ইহার উপায় কি? উত্তরে গোঁসাই কহিলেন, ইহার উপায়—স্বাধ্যায় এবং সৎসঙ্গ। স্বাধ্যায় অর্থে শাস্ত্রপাঠ। প্রতিদিন নিয়মিত-রূপে শাস্ত্রপাঠ করিবে এবং সাধু-সঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবে। যাঁহাদিগকে দেখিলে, যাঁহাদের নিকট বসিলে, যাঁহাদের কথা শুনিলে চিত্ত আপনা হইতে ভগবন্মুখী হয়, তাঁহারাই সাধু। এইরূপ সাধুর সঙ্গ করিবে। এ সকলেই ধর্ম্মসাধনের নিত্য কর্ম্ম। এই নিত্য কর্ম্ম নিষ্ঠা-সহকারে প্রতিদিন করিবে। ইহার ফলে ভগবদারাধনার উপযোগী ভাবেরও সাধন হইয়া যাইবে।

এইরূপে গোঁসাই ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকে নিজের ধর্ম্মসাধনের এবং ধর্ম্মজীবন-গঠনের অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যখন উপাসনা

করিতেন, তখন তাঁর ইষ্টদেবতাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকিতেন। উপাসক-মণ্ডলীর মুখ চাহিয়া তিনি কোনও দিন ব্রহ্মোপাসনা করেন নাই। দেবতার সম্মুখীন হইয়া তিনি সর্ব্বদা তাঁহারই স্তব-স্তুতি করিতেন। দেবতা প্রত্যক্ষ আছেন, এ অনুভব অন্তর হইতে সরিয়া গেলেই গোঁসাইয়ের কণ্ঠ কি সামাজিক উপাসনা-কালে, কি সঙ্গীত-সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে, সর্ব্বদাই আপনি নীরব হইয়া যাইত। যেমন উপাসনায়, সেইরূপ উপদেশাদি দিবার সময়েও গোঁসাইয়ের দৃষ্টি সর্ব্বোপরি আপনার উপরে পড়িয়া থাকিত। নিজের শোধনের জন্যই, নিজের চিত্তদর্পণকে নির্ম্মল এবং আদর্শের অনুশীলনের দ্বারা আপনার চরিত্রকে উন্নত করিবার জন্যই তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদী হইতে উপদেশাদি দিতেন। এইজন্য তাঁহার উপদেশের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা অসাধারণ আন্তরিকতা বিদ্যমান থাকিত। আর এই আন্তরিকতার গুণেই তাঁহার সহজ, সরল, পাণ্ডিত্যাড়ম্বরশূন্য কথাগুলি লোকের এত মর্ম্মস্পর্শী হইত। এইরূপে গোঁসাই ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকে আপনার ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রচার-ব্রত নিজের জীবনে এবং সমাজের জীবনে এমন অসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছিল।

‘আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখায়’

এই কথাটা বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের ভিতরে সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ হইয়াছিল। এই কথাটা না বুঝিলে, তাঁহার এই ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার-ব্রত কোন্ দিকে, কতটা পরিমাণে, কি সূত্রে তাঁহার শেষ-জীবনের চরম সিদ্ধির পথে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিল, ইহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব।

ধর্ম্মপ্রচারের আদর্শ

১৭৮৭ শকের ভাদ্র মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী মহাশয়কে ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের পদে অভিষিক্ত করেন, এ কথার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বেই ১৭৮৫ শকের ভাদ্র মাসে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার-ব্রত গ্রহণ করেন। প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিবার অল্প দিন মধ্যেই মহর্ষির অনুরোধে তিনি যশোরের অন্তর্গত বাগ-আঁচড়া গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন। এই গ্রামে অনেকগুলি দরিদ্র ভদ্রলোক বাস করিতেন। কলিকাতার ঠাকুর পরিবার ব্রাহ্মণ এবং হিন্দুসমাজের অন্তর্গত হইলেও, ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শ-দোষে হিন্দুসমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন। বাগ-আঁচড়ার অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-পরিবারও সেই কারণে হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়াও সমাজচ্যুত ছিলেন। কলিকাতার ঠাকুর-বংশের ধন-বল এবং বিদ্যা-বল প্রচুর ছিল। সুতরাং তাঁহারা নিজেদের ধন এবং বিদ্যার জোরে সমাজে মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারিতেন। বাগ-আঁচড়ার পীরালি ব্রাহ্মণদিগের সে শক্তি ছিল না। সকল দিক্ দিয়াই তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল। বোধ হয়, এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজ নামে একটা উদার ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া ইহারা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং একজন উপযুক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারককে তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য পাঠাইতে মহর্ষিকে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ অনুসারেই মহর্ষি গোস্বামী মহাশয়কে বাগ-আঁচড়ায় প্রেরণ করেন। গোঁসাই নিজেই লিখিয়াছেন ঃ—

"১৭৮৫ শকের ১০ই পৌষ আচার্য্য মহাশয়ের আদেশ অনুসারে বাগ-আঁচড়ায় গমন করিলাম। উক্ত গ্রাম কলিকাতার পূর্ব্বোত্তর প্রায় ৩৫ ক্রোশ অন্তর। বাষ্পীয়-শকট-যোগে চাকদহ অবতরণ করতঃ সেই স্থানের পূর্ব্বোত্তর ৮ ক্রোশ অন্তর গোপালনগর গ্রামের পান্থশালায় সে দিবস অবস্থিতি করিলাম। ১১ই পৌষ প্রাতঃকালে গোপালনগর হইতে গমন আরম্ভ করিয়া প্রায় দুইটার সময়ে বাগ-আঁচড়ায় উপস্থিত হই। যদিও পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম, কিন্তু অত্রত্য মল্লিক পরিবারের সরলতা ও ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়া আমার সমুদয় শ্রান্তি দূর হইয়া গেল। আমি দেখিলাম, মল্লিক পরিবারস্থ প্রায় সকল লোকই ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ। অনন্তর আহারান্তে 'ঈশ্বরের করুণা' বিষয়ে কিছু বলাতে সকলেরই অন্তর দ্রব হইতে লাগিল।

"পরদিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলাম। অনন্তর তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহান্ ভাব অবগত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে যথারীতি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে আরম্ভ করিলাম। আমি সেখানে নয় দিবস ছিলাম; ইহার মধ্যে তেইশটী পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ এক কালে পরিত্যাগ করিলেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই নির্ধন, কিন্তু ইহাদের ধর্ম্মবল সম্রাট্ হইতেও অধিক হইয়া উঠিল। ইঁহারা প্রায় সকলেই লেখাপড়া জানেন না; তথাপি প্রীতি, ভক্তি, কৃতজ্ঞতায় ইঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। যাঁহারা ভূরি ভূরি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া

বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, যাঁহাদের অর্থের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না, তাঁহারা একবার ঐ বিদ্যাবুদ্ধিহীন নিঃস্ব লোকদিগের ধর্ম্ম-বল প্রত্যক্ষ করিয়া শিক্ষা করুন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ধনী ও পণ্ডিতের জন্য নহে, ইহা পৃথিবীস্থ সমুদায় মনুষ্যগণের চিরসম্পত্তি। অনন্তর সেখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম।"

এই বাগ-আঁচড়া হইতেই ব্রাহ্মসমাজে প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। একদিন স্থানীয় ব্রাহ্মেরা গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে উপবীতধারণ ও জাতি-ভেদ মানার কথা উঠে। প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয় বাগ-আঁচড়ার এক-জন অগ্রণী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি কহিলেন—"যদি উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ হয়, তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবু উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদীর কার্য্য করেন কেন? তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে উপবীত রাখা উচিত মনে করিবে।" কথাটা গোস্বামীমহাশয়ের ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে যাইয়া আঘাত করিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন—"যদি ব্রাহ্মসমাজের এই কুরীতি সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে যে সমাজে অসত্যের প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত যোগ দিব না।" গোস্বামী মহাশয় সর্ব্বদাই যখন যাহা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন, তখনই তাহা পালন করিতে অগ্রসর হইতেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার কাল-বিলম্ব সহিত না। যেই মনে হইল যে, উপবীতধারী আচার্য্যের ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রাহ্মোপাসনা বা ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, অমনি তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে এই কথা লিখিয়া জানাইলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই প্রতিবাদ-পত্রে গোঁসাই কেশবচন্দ্রকে ইহাও জানাইলেন যে, যদি

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যগণ উপবীতধারী হন, তবে তিনি অসত্যের আলয় বলিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিবেন। কেশবচন্দ্র গোস্বামীমহাশয়ের প্রতিবাদ-পত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দিলেন। মহর্ষি গোস্বামী মহাশয়ের মতের অনুমোদন করিয়া কহিলেন, "বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবু কোনও ক্রমেই উপবীত ত্যাগ করিবেন না। অতএব দুইজন উপবীতত্যাগী উপাচার্য্য পাইলে, তাঁহারাই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইবেন।" গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে কেশবচন্দ্র তাঁহাকে এবং অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। গোস্বামী মহাশয় প্রথমে ইহাতে রাজী হইলেন না। কিন্তু কেশবচন্দ্র যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি এই ভার গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মসমাজের এ সংস্কার-কার্য্যটি সাধিত হইবে না, তখন অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যের প্রেরণায় শেষে রাজী হইলেন। গোস্বামী মহাশয় এবং অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য মনোনীত হইলে, সমাজের আচার্য্যগণের পক্ষে উপবীতধারণ নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু প্রাচীন ব্রাহ্মেরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা নানা উপায়ে ইহাতে বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় এবং অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উপাচার্য্য-পদে নিযুক্ত করা ঠিক হইলে পরে, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়কেও উপাচার্য্য-পদে বরণ করিবার বিবরণ "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া গেল। তখন জানা গেল যে, পাকড়াশী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করেন নাই। ইহাতে নবীন ব্রাহ্মেরা প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই আন্দোলনের ফলে ঐ "তত্ত্ববোধিনী" পুড়াইয়া নূতন করিয়া কেবল গোস্বামী মহাশয় এবং চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ই উপাচার্য্যের পদে বৃত হইবেন, এই বিজ্ঞাপন সহ "তত্ত্ববোধিনী" মুদ্রিত হইল। এই ভাবেই ইঁহারা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য-পদে নিযুক্ত হয়েন। এই উপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামীমহাশয়কে সম্বোধন করিয়া যে উপদেশ দেন, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই ঘটনা হইতে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে প্রাচীনে এবং নবীনে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ক্রমে সত্য এবং স্বাধীনতার নামে কেশবচন্দ্র ও বিজয়-কৃষ্ণ প্রভৃতি নবীন ব্রাহ্মেরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সত্য ও স্বাধীনতার সংগ্রামে বিজয়কৃষ্ণ একজন প্রধান অগ্রণী হইলেন।

কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা অনেক সময়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্র না হইয়া আপনার প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করি। গোস্বামীমহাশয়ের জীবনে একাধিক বার তাঁহাকে সত্যের, স্বাধীনতার এবং ধর্ম্মের খাতিরে নিতান্ত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। কিন্তু এ সকল সংগ্রামে তিনি কোনও দিন আদর্শচ্যুত বা আত্মবিস্মৃত হন নাই। কর্ত্তব্যের ডাকে গোঁসাই বজ্রের মত কঠোর হইতে পারিতেন এবং নির্ম্মম-ভাবে কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু ইহারই সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যের অনুরোধে যাঁহাদিগকে আঘাত করিতেন, নিরতিশয় কোমল স্নেহ এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহারও করিতেন। শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী কুর মহাশয় মহর্ষি এবং গোস্বামী সম্বন্ধে এইরূপ দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি কর্ত্তৃক উপাচার্য্য-পদে বৃত হওয়ার পর, একদিন মধ্যাহ্নে তিনি ব্রাহ্মসমাজ গৃহের দ্বিতীয় তলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি গরদের বস্ত্র, অঙ্গুরীয় ও একখানি পত্র লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। পত্রখানি মহর্ষির স্বহস্তে লিখিত, কিন্তু উহা

তাঁহার বৈবাহিকের স্বাক্ষরিত। উহাতে লেখা ছিল] "অদ্য সায়ং কালে আমার পৌত্রের নামকরণ, আপনি আসিয়া উপাচার্য্যের কাজ করিবেন এবং এই সামগ্রীগুলি গ্রহণ করিবেন।" অনুষ্ঠানের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে হইলে, ব্রাহ্মসমাজেও ক্রমে হিন্দুসমাজের ন্যায় পৌরোহিত্য প্রবেশ করিবে, এই ভয়ে তিনি বরণের দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিলেন না, পত্র লিখিয়া ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। মহর্ষির দুঃখ-প্রকাশ শুনিয়া গোঁসাইজী তাঁহার নিকট গিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অপর একদিন মহর্ষি বলিয়াছিলেন "আমি যেখানে যাইতে বলিব সেখানেই যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। তিনি ভাবিলেন, 'যে জীবন ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিয়াছি, সে জীবনে কিরূপে মনুষ্যের দাসত্ব করিব।' তিনি মহর্ষিকে বলিলেন, "ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া প্রচার-ক্ষেত্রে গমনাগমন না করিলে, জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। স্বাধীনভাবে প্রচার করিতে দিন। প্রচারের মধ্যে যেন সংসারের প্রভুত্ব প্রবেশ না করে।" ইহা শুনিয়া মহর্ষি লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সকল স্থানে গমন করিতে পারি না। এজন্য যেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা হয়, সেখানে যদি তুমি গমন কর, তাহা হইলে আমার মনে বিশেষ আনন্দ হয়।" তৎপরে বলিলেন, "স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সত্য প্রচার কর, বীজ বপন কর, ঈশ্বর কৃপায় সুফল উৎপন্ন হইবে। ফলের জন্য চিন্তা করিও না। ফল-দাতা ঈশ্বর তোমার সহায় থাকুন।"

এই ঘটনায় বিজয়কৃষ্ণ কোন ভাবের প্রেরণায়, কোন লক্ষ্য-সাধনের উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় তিনি এই

প্রচার-কার্য্যের একখানা বিবরণ লিখিয়া দেন। তাহাতে তাঁহার এই আদর্শটা আরও ফুটিয়া উঠে।

"১৭৮৫ শকের ভাদ্রমাসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাশয় আমাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। আমি সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক এই গুরুভার প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে ইহা সাধন করিতে সক্ষম হইব, তদ্বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। যখন স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন হতাশ হইয়া পড়ি। যখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি, তখন অতুল সাহসে পূর্ণ হইয়া উঠি। আমি এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া স্থির নিশ্চয় করিলাম যে—

ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের একমাত্র উপায়।"

এই ভাবের প্রেরণাতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার কর্ম্মের নিয়ামক হইতে চাহিলেন, বিজয়কৃষ্ণ তখন তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই মহর্ষি যখন তাঁহার সংসার-নির্ব্বাহের জন্য একটা বৃত্তি বাঁধিয়া দিতে চাহিলেন, বিজয়কৃষ্ণ বিনীত-ভাবে তাহাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ভগবানের উপরে নির্ভরতা-লাভ সহজ কথা নহে। বহু সাধন, বহু তপস্যার ফলে এ নির্ভরতা লাভ হয়। আর আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা এ সকল সাধন ও তপস্যার একটা অতি প্রধান অঙ্গ। সিদ্ধিলাভের পরেও গোস্বামীমহাশয় সর্ব্বদাই এই অবকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিতেন এবং তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে যাহারা এ সাধনের অধিকারী, তাহাদিগকে এ বিষয়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। মনে পড়ে, সুহৃদ্বর ৺মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়ের কথা। এই সময়ে মনোরঞ্জনবাবু কলিকাতায় সপরিবারে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন এবং অন্যান্য প্রচারকেরা

যেমন এক-রূপ আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, মনোরঞ্জন বাবুও তাহাই করিতেন। সে এক অদ্ভুত কাহিনী। এমন দিন গিয়াছে যে, ঘরের চালে খড় নাই, হাঁড়ীতে ভাত নাই। ছেলেপিলেদের লইয়া গৃহজায়া অনশনে বা অর্দ্ধাশনে কাটাইয়াছেন। কিন্তু কোনদিনও তাঁহার মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে নাই। আর যখনই একান্ত অচল হইয়া পড়িত, তখন অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্যও আসিয়া পড়িত। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়াও বহু দিন মনোরঞ্জনবাবু এই প্রচারক-জীবনই যাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে একবার তিনি কলিকাতায় মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় একটা বাড়ীতে উঠিয়া যান। তাঁহার এই বাড়ী-ভাড়ার কার্য্য লইয়া গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ নানা প্রকারের সমালোচনা আরম্ভ করেন। কেহ বলিলেন, মনোরঞ্জনবাবু অত টাকা বাড়ী ভাড়া দিবেন কোথা হইতে; কেহ বলিলেন, তাঁহার অবস্থা বিবেচনায় মনোরঞ্জন বাবুর কম ভাড়ায় একটা ছোট বাড়ী লওয়া কর্ত্তব্য ছিল। গোঁসাই ইহাদের এ সকল কথা বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে শুনিয়া, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা মনোরঞ্জনবাবুর সংসার-যাত্রার হিসাব তৈয়ার করিতেছ, কিসের উপরে? যাদের নির্দ্দিষ্ট আয় আছে, তাদেরই ব্যয়ের বজেট করা সম্ভব হয়। যাঁর এক পয়সাও নির্দ্দিষ্ট আয় নাই, তাঁর খরচের বজেট করিবে কিরূপে? এখানে আয়ের হিসাবে ব্যয়ের ব্যবস্থা করাও চলে না, এখানে যথার্থ প্রয়োজনের মাপকাটি দিয়াই ব্যয়ের ভার মাথায় লইতে হয়। মনোরঞ্জনবাবু যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়ের আয়োজন করেন, তাঁহার অপরাধ হইবে। কিন্তু প্রয়োজন মাফিক করিলে কোনও অপরাধ হইতে পারে না।" এই ভাবেই গোস্বামী মহাশয় আযৌবন ভগবানের উপরে নির্ভরতার সাধন

করিয়াছিলেন। এই সাধনের বলেই শেষ বয়সে সিদ্ধিলাভের পরে, তিনি জগতের ভক্ত ও সাধকদিগের মত "কল্যকার জন্য একটুও চিন্তা করিতেন না।" যেদিন যাহা ভগবান দিতেন, সেইদিনই তাহা অকাতরে খরচ করিতেন। প্রয়াগ-ধামে কুম্ভমেলায় যাইয়া তিনি নিজের হাতে ভাণ্ডারের খরচপত্রের টাকা কড়ি সব লইয়া, শিষ্যদিগকে এই নির্ভরতা-সাধনই শিখাইয়াছিলেন। সে এক অপূর্ব্ব কথা, কিন্তু তাহা সবিস্তারে উল্লেখ করিবার স্থান এ নহে।

গোস্বামীমহাশয়ের ধর্ম্মপ্রচারের আদর্শ কি ছিল, "ধর্ম্মতত্ত্বে" প্রকাশিত তাঁহার স্বরচিত একটী প্রবন্ধে ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী কর মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এই প্রবন্ধটী তুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক হইতে আমি পুনরুদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের একজন অধম প্রচারক। আমি নামের বা গৌরবের জন্য প্রচার-ব্রত গ্রহণ করি নাই। আমার আত্মার গভীর স্থানে কি একটী আশ্চর্য্য শক্তি আছে। এ শক্তি আমার নহে। ইহা আমার যত্ন-সাপেক্ষ নহে, ইহার উপর আমার কোন প্রভুত্ব নাই। আমার ইচ্ছার সঙ্গেও ইহার প্রায় কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এই শক্তি আমাকে অন্ধের ন্যায় পরিচালন করে এবং ভবিষ্যতে কোথায় পরিচালন করিবে, বলিতে পারি না। ইহা আমার প্রবৃত্তিকে জগতের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে আদেশ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছানুমত কার্য্য-সম্পাদনে ইহাই আমাকে উত্তেজনা করে এবং নিজের আত্মার মহোন্নতি সাধন করিতেও ব্যাকুল করে। ইহার আদেশ এত পরিষ্কার ও বোধগম্য যে, আমি কখন ইহা বিস্মৃত হইতে ও অগ্রাহ্য করিতে পারি না।

"ইহাই আমাকে প্রচারক নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমি সর্ব্বদা মনকে বুঝাই, বলি, 'হৃদয় তুমি কি জানিতেছ না যে, তুমি অত্যন্ত মলিন ও অধম? তুমি কি সাহসে প্রচার-কার্য্যের গুরুভার আপনার মস্তকে লইতে সাহসী হইলেও' কিন্তু পরক্ষণেই উপরিলিখিত শক্তি আমার অন্তরে উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং বলে—'তুমি অগ্রসর হও।' আমার বিশ্বাস, এই শক্তির আদেশ ঈশ্বরের বাক্য, ইহা প্রচারকের জীবন। ইহাই ভয় বিপদের সম্বল, নিরাশার ঔষধ, প্রার্থনার ইন্ধন। ইহা ব্যতীত আমি অন্ধ অপেক্ষাও অসহায় হইয়া যাই, মুমূর্ষু অপেক্ষাও নির্জ্জীব হইয়া যাই।

আমি সততই এই শক্তির আদেশ গ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করি। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, তাহা প্রতিপালন করি এবং যখনই প্রতিপালন করিতে সাহসী হই, তখনই সফলতা লাভ করি। তখন আমার আত্মাতে আলোক আসে; আমি যাহা বলি, লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। আমি যাহা বলি, যাহা করি, তাহাতে আমার অনুমাত্র গৌরব নাই। কারণ আমি নিঃসন্দেহে জানিতে পারি যে, ইহা আমার শক্তি হইতে নহে। যদি আমার শক্তি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে লোকের নিকট এরূপ হাস্যাস্পদ ও বিফল হই যে, তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অক্ষম। কার্য্যের সময়ে আপনার প্রতি নির্ভর করিতে হইবে, ইহা মনে হইলে যথার্থ বলিতেছি, আমার শরীর কম্পিত হয়। আমি নিশ্চয় জানিতেছি, আমার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্ভবে না এবং কোন কার্য্যের গৌরবেই আমার অধিকার নাই। পাপে পুণ্যে, সুখে অসুখে, সম্পদে দারিদ্র্যে আমি এই অদ্ভুত শক্তির আদেশ শুনিতে পাই। নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ দেখিয়া হৃদয় যখন উচ্চ ও প্রশস্ত হয়, তখন ইহা আমাকে বলে, 'তুমি এমন সুন্দর জগতে

এক স্থানে বসিয়া কি করিবে?' যখন সুন্দর সুমিষ্ট মারুত আমার তাবৎ শরীরকে সুখী করে, তখন ইহা বলে, 'তুমি কি সুখে গৃহে বসিয়া আছ? এই অনিল-হিল্লোল কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, বিবেচনা কর এবং তুমিও সেইরূপ সর্ব্ব স্থানে ভ্রমণ কর। ইহার রমণীয়তা দেশভেদে, কালভেদে অসমান নহে; তোমার অনুরাগ ও চেষ্টা সেইরূপ মধুর-বাহিনী হইবে, অগ্রসর হও।' অমনি আমার শরীর মন ব্যাকুলিত হইয়া উঠে এবং যেখানে তাঁহার কার্য্য সেখানেই যাইতে ব্যস্ত হয়। 'অগ্রসর হও' এই প্রকার আদেশ শুনিলে আমার হৃৎকম্প হয়; ভয়ে, দুঃখে, বিশ্বাসে, বিস্ময়ে অন্তর পরিপূর্ণ হয়। আমি কোন ক্রমেই ঐ আদেশ শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহা আমার গৌরব নহে, কিন্তু মনের কথা এবং কেনই যে এ কথা লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইবে না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমার সকল অবস্থাতেই আমি ইহার বশবর্ত্তী হইয়াছি এবং সকল অবস্থাতেই হইব। ইহার বশবর্ত্তী হইয়া সকল সময়েই আমি আশার অতীত ফললাভ করিয়াছি। অবিশ্বাস, অহঙ্কার ও নৈরাশ্য ইহারই জন্য আমাকে গতাসু করিতে পারে না; নতুবা আমি যেরূপ, এই জ্যোতির্ম্ময় অখণ্ড শক্তির ইঙ্গিতে যে তীর্থস্থানে গমন করিবার আমার এত আশা, যেখানকার কথা শুনিলে আমার নয়ন-বারি বিগলিত হয় এবং যেখানে যাইবার জন্য সততই আমার দুর্ব্বল চরণ ব্যস্ত রহিয়াছে, পরিণামে নির্ব্বিঘ্নে আমি সেই প্রাণসম তীর্থস্থানে উপনীত হইতে পারিব না। পরমেশ্বর আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। কি কারণে আমি প্রচারক হইয়াছি এবং কেনই যে আমি অদ্যাবধি প্রচারক নাম ধারণ করিতেছি, তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।

সত্যের সংগ্রাম

যশোরের অন্তর্গত বাগ-আঁচড়া গ্রামেই বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার রীতিমত আরব্ধ হয়। বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মের আদর্শ জীবনের সকল বিভাগকে অধিকার করিয়াছিল। পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম-সাহিত্যে যে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মযোগের কথা পড়িতে পাই, বিজয়কৃষ্ণের জীবনে তাহা প্রথম হইতেই ফুটিতে আরম্ভ করে। কেবল ঈশ্বরোপসনাতেই তাঁহার ধর্ম্মসাধনা আবদ্ধ ছিল না। ঈশ্বরের সত্য উপাসনা করিতে হইলে, ঈশ্বর-সম্বন্ধে সত্য জ্ঞানলাভ আবশ্যক। এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পাতা রূপেই ঈশ্বরের প্রথম অনুভব হয়। আমাদের প্রাচীন বেদান্তে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, যাঁহার মধ্যে এই বিশ্ব স্থিতি করিতেছে, এই বিশ্বের অবিরাম পরিবর্ত্তন-স্রোতঃ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে এবং অন্তিমে যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তিনিই ব্রহ্ম—এই ভাবেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছেন। সুতরাং এই ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, এই বিশ্বের জ্ঞানলাভ করিতে হয়। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের জ্ঞানকে প্রাচীনেরা অপরা বিদ্যা কহিয়াছেন। আর এই অপরা বিদ্যার অনুশীলন পরা বিদ্যা বা শ্রেষ্ঠবিদ্যা যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহার দ্বার-স্বরূপ। ভৃগুবারুণী-সংবাদে উপনিষৎ এই তত্ত্বটাই বিশেষ-ভাবে প্রচার করিয়াছেন। বরুণ-পুত্র ভৃগু ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্য লালায়িত হইয়া পিতাকে যাইয়া কহিলেন, "হে ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দান করুন।" বরুণ কহিলেন, "এই ইন্দ্রিয়-সকল, এই মন, এই বুদ্ধি এ সকলই ব্রহ্ম-লাভের

দ্বার স্বরূপ। তপস্যার দ্বারা, অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মকে অন্বেষণ কর।” কিন্তু ধ্যান শূন্যে বসে না। ধ্যানের আশ্রয় চাই, ধ্যানের বিষয় চাই, ধ্যানের সূত্র চাই। বরুণ পুত্রকে এই ধ্যান-সূত্র দিতে যাইয়া কহিলেন, “যাহা হইতে এই ভূতগ্রাম জন্মিয়াছে, জন্মিয়া যাহার দ্বারা এই ভূতগ্রাম জীবিত রহিতেছে, যাহার প্রতি এই ভূতগ্রাম গমন করিতেছে, অন্তিমে যাহার মধ্যে এই ভূতগ্রাম প্রবেশ করিতেছে, তাহাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে বিশেষ-ভাবে জানিতে চেষ্টা কর।” ইহাই সার্ব্বজনীন ঈশ্বর-তত্ত্বের বা ব্রহ্ম-তত্ত্বের এবং ঈশ্বর-জ্ঞান বা ব্রহ্ম-জ্ঞানের পথ। ইহার আর পথ নাই। সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, আদিতে এই পরিদৃশ্যমান বিষয়-জগতের যথাযথ জ্ঞানলাভ করিতেই হইবে। ব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা। এই জগৎ তাঁর কার্য্য। কর্ত্তাকে তাঁহার কার্য্যের ভিতর দিয়াই জানিতে হয়। কার্য্যের মধ্যেই কর্ত্তার কর্ত্তৃ-স্বরূপ প্রকট হইয়া থাকে। ইহাই ভৃগু-বারুণী উপাখ্যানের ব্রহ্ম-তত্ত্বের গোড়ার কথা।

আমরা মধ্যযুগে এই গোড়ার কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়া কেবল কিম্বদন্তীর উপর ধর্ম্মসাধনা গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলাম। ধর্ম্ম এইজন্য শাস্ত্রে ও লোকাচারের মধ্যেই বাঁধা পড়িয়াছিল, সাধারণ সাধকের অনুভবে প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছিল না। এইজন্য আধুনিক ধর্ম্ম-সংস্কারে ও ধর্ম্ম-সাধনে ঈশ্বর-জ্ঞান বা ব্রহ্ম-জ্ঞানের উপর ধর্ম্মকে গড়িয়া তোলা আবশ্যক হয়। জাগতিক জ্ঞানের চর্চ্চা ও আলোচনার দ্বারা একদিকে বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করার প্রয়োজন হয়, আর জগৎ-কার্য্যের যথাযথ জ্ঞান বিস্তার করিয়া, সেই জ্ঞানের উপরে ঈশ্বর-জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইতে হয়। ব্রাহ্মসমাজ প্রথমাবধিই এইজন্য জাগতিক জ্ঞানের প্রচার, অপরা বিদ্যার অনুশীলন ঈশ্বর-জ্ঞান-লাভের ও পরাবিদ্যার অনুশীলনের

অতি প্রধান অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন। বিজয়কৃষ্ণ ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবধিই এই ভিত্তির উপর নিজের সাধনকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন না—বহু বিদ্যার অনুশীলন করিয়া বিদ্যার বোঝা কোন দিন বহন করিতে চাহেন নাই। কিন্তু সর্ব্বপ্রকারের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনার প্রতি সর্ব্বদাই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধালু দেখিয়াছি। প্রথম যৌবনে তিনি কেবল স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের লোভেই ডাক্তারী শিখিতে যান নাই; ইহার ভিতরে তাঁর অন্যতর গভীর উদ্দেশ্যও ছিল। এক—জড়বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, দেহতত্ত্বাদির অনুশীলনের দ্বারা জগৎ ও জীবের নিয়ন্তা যিনি তাঁর জ্ঞান লাভ করা। দ্বিতীয়, লোকসেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াও তিনি এই দুইটি উদ্দেশ্য ভুলেন নাই। বাগ-আঁচড়ায় তিনি যে-ভাবে আপনার প্রচার-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে এই ভাবটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার জীবন-চরিত-লেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী কর মহাশয় বিজয়কৃষ্ণের এ সময়কার দৈনন্দিন কাজের যে তালিকা দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, গোস্বামী মহাশয় প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় অর্থাৎ ঈশ্বর-চিন্তা ও ঈশ্বর-ধ্যানে অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল নির্জ্জনে অতিবাহিত করিতেন। ইহার পরে, যে সকল রোগী তাঁহার বাড়ীতে আসিতেন তাঁহাদের দেখিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা দিতেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট আসিতে পারিতেন না, তাহার পর তিনি বাড়ী যাইয়া তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। কাহারও নিকট হইতে তিনি কোনও প্রকারের দর্শনী বা দক্ষিণা লইতেন না। এই কাজে পূর্ব্বাহ্ণ অতিবাহিত হইত। রোগী দেখা শেষ হইলে, তিনি বাড়ী ফিরিয়া স্নান ও মধ্যাহ্নের

উপাসনা সমাপনান্তে আহার করিতেন। দ্বিপ্রহরে তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়াইতে যাইতেন। স্কুলের কাজ শেষ হইতে প্রায় পাঁচটা বাজিয়া যাইত। তখন বাড়ী ফিরিয়া তিনি একটুকু জলযোগ ও বিশ্রামের পরে আপনার সহধর্ম্মিণীকে পড়াইতেন। তারপর, সন্ধ্যাকালে পালা-মত যে দিন যে পল্লীতে যাইয়া সামাজিক ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে যাইতেন। এই কাজ শেষ হইলে তিনি বাগ-আঁচড়া বাজারে গরীব শ্রম-জীবিগণকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য নৈশবিদ্যালয়ে যাইয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতেন। ইহার পরে, তিনি রাত্রে ধর্ম্মবন্ধুদিগের সঙ্গে সদালাপ ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া কিছু কাল অতিবাহিত করিতেন। ইহা ছাড়া, তিনি স্ত্রীশিক্ষার ও সঙ্গীত-সভার পরিচালনা করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ এই সময়ে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে বোধ হয় মহর্ষিকে এক পত্র লিখেন, সে সময়ের "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় তাহার কতকটা উদ্ধৃত হইয়াছিল। এই পত্রে বিজয়কৃষ্ণ লিখিয়াছিলেন, "এখানে সম্প্রতি আমাকে এই কয়েকটি কার্য্য করিতে হয়—প্রাতঃকালে চিকিৎসা, মধ্যাহ্নে বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষকতা; রাত্রিতে নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা; বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৈকালে ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ, শনিবার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা।"

বিজয়কৃষ্ণের মতন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম অতি অল্পই ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরোপাসনায় তাঁহার যেমন আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল, লোক-সেবায় তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। মানুষের কাজে ডাক পড়িলে, গোঁসাই কোনও দিন ভগবদারাধনার মধুর তৃপ্তি ছাড়িয়া জীবের সেবায় ছুটিয়া যাইতে তিলার্দ্ধ পরিমাণ দ্বিধা করিতেন না। বঙ্কুবাবুর গ্রন্থে একদিন্‌কার এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাই। একদিন ধর্ম্মালোচনার সময়ে এক মুসলমানের বাড়ীতে আগুন লাগে। এই

কথা শুনিবামাত্র বিজয়কৃষ্ণ ধর্ম্মালোচনা বন্ধ করিয়া, "কোমরে কাপড় জড়াইয়া ছুটিলেন এবং বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া বিপন্ন গৃহস্থকে বিপদ্ হইতে যথাসম্ভব রক্ষা করিলেন।"

বিজয়কৃষ্ণের এই প্রচার-কার্য্য বাগ-আঁচড়া গ্রামে অল্পকাল মধ্যেই আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছিল। বাগ-আঁচড়ার লোকেদের অবস্থা অত্যন্ত অসচ্ছল ছিল। তাঁহাদের অনেকেই অতি সামান্য ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে ও উপদেশে তাঁহাদের জীবনে ও আচার-আচরণে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল। এদেশে বেচা-কেনা অত্যন্ত হীন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বিক্রেতা ও ক্রেতা কে কাহাকে কতটা ঠকাইয়া নিজে দু'পয়সা লাভ করিতে পারিবেন, সর্ব্বদাই তার চেষ্টা করেন। এইজন্য উভয়ের চরিত্রই অত্যন্ত লঘু ও স্বভাব নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে। অতি সামান্য বস্তু কিনিতে গেলেও অযথা সময় ও শক্তির অপচয় করিতে হয়। সে-কালের ব্রাহ্মদিগের জীবনের প্রথম কথা ছিল—সত্য কথা কওয়া, সত্য আচরণ করা। সুতরাং ব্রাহ্মেরা ব্যবসা করিতে যাইয়া দর-দস্তুর করিতে পারিতেন না, তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধিতে আঘাত লাগিত। বিজয়কৃষ্ণের চরিত্র ও উপদেশের দ্বারা এই ভাবটা গরীব বাগ-আঁচড়াবাসী নূতন ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও সংক্রামিত হইল। তাঁহারা দাম-দস্তুর করা পাপ-বোধে পরিত্যাগ করিলেন। কেহ কিছু ক্রয় করিতে আসিলে, সরল-ভাবে এক কালেই যে বস্তুর যাহা যথার্থ মূল্য তাহা চাহিতেন। "এই দ্রব্যের এই মূল্য; ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, না হয় করিও না। আমরা ব্রাহ্ম, আমরা দর করি না।" যাঁহারা মামলা মকদ্দমা করিতেন, তাঁহারাও অসত্যের ভয়ে মকদ্দমা করা ছাড়িয়া দিলেন। যাঁহারা কোন কারণে প্রতিবেশী বা

গ্রামস্থ লোকদিগের সহিত বিষয়-ঘটিত কোনও বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ অনুসরণ করিতে যাইয়া সে সকল বিবাদ বিসম্বাদ হইতে এক কালে নিরস্ত হইলেন। এইরূপে বিজয়কৃষ্ণের সাধনা এই গ্রামে অতি অল্পকাল-মধ্যেই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিল। ইহার দ্বারাই তাঁর প্রচার-ব্রতের সাত্ত্বিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিজয়কৃষ্ণের বাগ-আঁচড়ার প্রচার-কার্য্যোপলক্ষে অবস্থান-কালেই মহর্ষি এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কেশবচন্দ্র প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মদিগের বিবাদের সূত্রপাত হয়। বিজয়কৃষ্ণের সারল্য ও সত্যনিষ্ঠাই এই বিবাদের মূল।

বাগ-আঁচড়ায় একদিন ধর্ম্মালোচনা-প্রসঙ্গে উপবীত-ধারণ ও জাতিভেদের কথা উঠে। সে সময়ে ৺প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয় বাগ-আঁচড়ায় একজন প্রধান ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি কহিলেন, "যদি উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ হয়, তবে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবু উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদীর কার্য্য করেন কেন? তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে উপবীত রাখা উচিত মনে করিবে।" কথাটা বিজয়কৃষ্ণের প্রাণে বাজিল। তিনি মনে মনে আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে—

"ব্রাহ্ম-সমাজে এইরূপ অসত্য ব্যবহার থাকা উচিত নহে। যদি ব্রাহ্ম-সমাজের এই কু-রীতি সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে যে সমাজে অসত্যের প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত যোগ দিব না।"

বিজয়কৃষ্ণ আজীবন যখনই যাহা সত্য ও ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তখনই সকল প্রকারের ফলাফলচিন্তা-বিরহিত হইয়া তাহার অনুসরণ করিতেন। এসকল বিষয়ে তাঁর কাল-বিলম্ব সহিত না।

প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয়ের কথা শুনিয়া যেই তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্যের পক্ষে উপবীত-ধারণ অন্যায় বলিয়া বুঝিলেন, অমনি তাহার প্রতিষেধের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কাল-বিলম্ব না করিয়া তিনি তখনই এই বিষয়ে সমাজের সম্পাদক কেশবচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। এই বিষয়ের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও লিখিয়া দিলেন যে—

"যদি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যগণ উপবীতধারী হন, তবে আমি অসত্যের আলয় বলিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিব।"

এইরূপে, এই পত্রে বিজয়কৃষ্ণই ব্রাহ্ম-সমাজের এই নূতন সত্যের সংগ্রামে প্রথম দুন্দুভি বাজাইয়া দিলেন। পরে কেশবচন্দ্র এই সংগ্রামে নবীন ব্রাহ্মদিগের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্ম-সমাজের ও আধুনিক বাংলা-দেশের এবং ভারতবর্ষের চিন্তা ও সাধনার ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটন করেন।

কেশবচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণের পত্রখানি মহর্ষির হাতে দিলেন। মহর্ষি বিজয়কৃষ্ণের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহার মতের অনুমোদন করিয়া কহিলেন—"বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবু কোন ক্রমেই উপবীত পরিত্যাগ করিবেন না। অতএব দুইজন উপবীত-ত্যাগী উপাচার্য্য পাইলে তাঁহারাই কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য হইবেন।"

বিজয়কৃষ্ণ এবং অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ইঁহারাই তখন দুই জন উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হইবার যোগ্য ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই অতিশয় সত্যনিষ্ঠ, সাধু-চরিত্র ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মেরা সকলেই ইঁহাদিগকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহারা যদি উপাচার্য্যের পদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উপবীতধারী

বেদান্তবাগীশ ও বেচারামবাবুর স্থানে ইঁহাদিগকে সমাজের উপাচার্য্য নিয়োগ করা যায়—মহর্ষির এই মনোভাব বুঝিয়া কেশবচন্দ্র ইঁহাদিগকে এই ভাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে ইহাতে সম্মত হন নাই—এ-কথা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। আর কি জানি, পাছে মনের অগোচরেও ইহার অন্তরালে কোনও প্রকারের আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা লুকাইয়া থাকে, এই ভয়েই তিনি পদ গ্রহণ করিতে এতটা অনিচ্ছুক ছিলেন। ইহাতেও বিজয়কৃষ্ণ আযৌবন কতটা পরিমাণে যে সজাগ থাকিবার চেষ্টা করিতেন, ইহার আর একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কেশবচন্দ্র যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি এই পদ গ্রহণ না করিলে নির্ব্বিবাদে ব্রাহ্ম-সমাজের এই প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন সহজ হইবে না, তখন বিজয়কৃষ্ণ অগত্যা রাজী হন। কিন্তু ইহাতেও কুলাইল না। যে বিরোধের আগুন প্রধূমিত হইতেছিল তাহা একবারে জ্বলিয়া উঠিল।

এই ঝগড়ার মূল কারণ—সমাজ-সংস্কার। ব্রাহ্মেরা যত দিন কেবল-মাত্র ব্রহ্মোপাসনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তত দিন প্রাচীন সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও প্রত্যক্ষ বিরোধ বাধে নাই। হিন্দু-সমাজ, বিশেষতঃ এই বাংলাদেশে বহুদিন হইতেই লোককে সাধন-ভজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া আসিতেছিল। কে কোন পথে আপনার মুক্তি খুঁজিবে, কে কোন ভাবে কোন দেবতার ভজনা করিবে, এ সকল বিষয় লইয়া সমাজ মাথা ঘামাইত না। সমাজ ধর্ম্মের মতবাদ বা সাধনের প্রণালী ও প্রক্রিয়া লইয়া কাহারও সঙ্গে কোন বিরোধ করিত না। সমাজ কেবল এইটী দেখিত যে, লোকে আচার বিচার মান্য করে কি না। যাঁহারা জাতিভেদ মানিয়া চলিতেন, বিবাহাদি সংস্কার স্মৃত্যনুসারে করিতেন, তাঁহারা যে-ভাবে ইচ্ছা নিজেদের ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধন করিতে

পারিতেন, সমাজ তাহাতে কোনও প্রকার বাধা দিত না। ব্রাহ্মেরা যত দিন জাতি-ভেদ মানিয়া চলিয়াছিলেন, বিবাহাদি সংস্কারে স্মৃতির অনুসরণ করিতেছিলেন, তত দিন সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের কোনও বিরোধ বাধে নাই। রাজার সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রায় সকল সভ্যই সমাজের অনুগত হইয়া চলিতেন। তাঁহারা ব্রাহ্ম-সভায় যাইয়া ব্রহ্মোপাসনাতেও যোগদান করিতেন, আবার তাঁহাদের নিজেদের বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবাদিও হইত। দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতি রাজার বন্ধুগণের সকলের বাড়ীতেই এ সকল হিন্দু পূজাপার্ব্বণ যথাবিধি সম্পাদিত হইত। তাঁহারা গোপনে গোপনে যাহাই করুন না কেন, প্রকাশ্য-ভাবে জাতিভেদও মানিয়া চলিতেন এবং স্মৃত্যনুসারে নিজেদের পরিবারে বিবাহাদি সংস্কারের অনুষ্ঠানও করিতেন। প্রতিবেশী হিন্দুরা তাঁহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ যাহাই করুন না কেন, সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন নাই। কেবল একমাত্র রাজা রামমোহন সমাজ-বহির্ভূত হইয়াছিলেন ; কেবল তাঁহার বাড়ীতেই দোল-দুর্গোৎসবাদি বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পরিবার-পরিজনেরা সামাজিক নিমন্ত্রণাদি রক্ষা করিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে একবার দুর্গোৎসব উপলক্ষে রাজার নিমন্ত্রণ হয়। দেবেন্দ্রনাথ পিতার প্রতিনিধি হইয়া নিমন্ত্রণ করিতে যান। রাজা দেবেন্দ্রনাথকে আদর করিয়া "বেরাদর" বলিয়া ডাকিতেন। নিমন্ত্রণ পাইয়া তিনি কহিলেন, "বেরাদর, আমি ত প্রতিমা-পূজায় যোগ দিই না। রমাপ্রসাদকে যাইয়া নিমন্ত্রণ কর।" মহর্ষির মুখে এই ঘটনার কথা শুনিয়াছি। রাজা সামাজিক পূজাপার্ব্বণাদিতে যোগ না দিলেও, তাঁহার পুত্র রমাপ্রসাদ সে সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। রাজার সময় হইতেই নূতন ভজনমণ্ডলীর মধ্যে এই রীতি চলিয়া আসিয়াছিল। ব্রহ্মোপাসনা করিতে যাইয়া তাঁহারা

প্রচলিত পূজা-পার্ব্বণাদি একেবারে বর্জ্জন করেন নাই। জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক আচার-বিচার তাঁহারা সর্ব্বদাই মানিয়া চলিতেন। ক্রমে নূতন ইংরাজী-শিক্ষার প্রভাবে, নব্য-শিক্ষিত যুবক-সমাজে যখন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিবাদের আদর্শ খুব ফুটিয়া উঠিল এবং দলে দলে ইহারা দেশের প্রচলিত ধর্ম্মমত ও সামাজিক রীতি-নীতির প্রত্যাখ্যান করিয়া, প্রকাশ্য-ভাবে নিজেদের এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের নবীন ও প্রাচীনদের মধ্যে একটা সাংঘাতিক বিরোধের সূত্রপাত হইল। নবীন ব্রাহ্মেরা কেবল ব্রহ্মোপাসনা করিলেই নিজেদের জীবন ও চরিত্র ঠিক ধর্ম্মানুমোদিত হইল, এরূপ ভাবিতে পারিতেন না। সত্য তখন ব্রাহ্ম-সমাজের মূলমন্ত্র ছিল। যাহা সত্য তাহাকে জীবনের সকল বিষয়ে বরণ করিয়া লইতে হইবে—ইহাই তাঁহাদের জীবনের আদর্শ হইল। প্রতিমা-পূজা মিথ্যা—অতএব প্রতিমা-পূজা করা পাপ, প্রতিমা-পূজায় যোগদান করা পাপ, প্রতিমার সমক্ষে প্রণাম করা পাপ, প্রতিমা-পূজার সমর্থন করা পাপ। কথায় বা আচরণে এই পাপের সমর্থন করা ইঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। জাতিভেদ মিথ্যা। সুতরাং জাতিভেদ মানিয়া চলা পাপ। জাতিভেদের সমর্থন করা পাপ। এই জন্য ইঁহারা জাতি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। সমাজের সঙ্গে নবীন ব্রাহ্ম-দলের এইরূপে একটা সাংঘাতিক বিরোধ বাধিয়া উঠিল। প্রাচীন ব্রাহ্মেরা প্রাচীন সমাজের সঙ্গেই মিশিয়া ছিলেন। ব্রহ্মোপাসনায় তাঁহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা সত্ত্বেও প্রচলিত প্রতিমা-পূজাদির সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধ বাধে নাই। তাঁহারা এই বিরোধ বাধাইতেও রাজী ছিলেন না। সুতরাং এ সকল সংস্কার লইয়া নবীন ও প্রাচীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটা গুরুতর বিরোধ বাধিয়া উঠিল।

জাতিভেদই এই বিরোধের মূল। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার অল্প দিন পরেই জাতিভেদের চিহ্ন মনে করিয়া উপবীত ত্যাগ করেন—পূর্ব্বেই এই কথা কহিয়াছি। উপবীত ত্যাগ করা ব্রাহ্মদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কি না, এ বিষয়ে মহর্ষির সঙ্গে তাঁর কথা হয়। মহর্ষি তাঁহাকে কহেন যে, তিনি নিজে উপবীত ধারণ করেন, ইহাতে কোনও দোষ আছে বলিয়া মনে করেন না। এই প্রসঙ্গেরও উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মহর্ষির কথায় বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে যে জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল তাহার মীমাংসা হইল না। মহর্ষি উপবীত ধারণ করেন বলিয়া তিনি বিজয়কৃষ্ণের শ্রদ্ধা হারাইলেন না; কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার দৃষ্টান্তে উপবীত রাখিতে পারিলেন না। তিনি আপনার অন্তরে ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণায় উপবীত ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কেবল উপবীত-ত্যাগেই জাতিভেদ ভাঙ্গে না। বিজয়কৃষ্ণের মনে এই কথাটাই আলোড়িত হইতে লাগিল। তিনি কহিয়াছেন ঃ—

“আমি একদিন বসিয়া ভাবিতেছিলাম, ব্রাহ্মসমাজ হইতে জাতি-ভেদের শৃঙ্খল দূর করিতে হইবে। কিন্তু কেবল উপবীত-ত্যাগ নয়, অসবর্ণ বিবাহ না দিলে এই শৃঙ্খল-মোচনের অন্য উপায় নাই। এই জন্য অসবর্ণ-বিবাহ-প্রচলনের ইচ্ছা হয়। মনে হইল, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারে, এরূপ লোক কোথায় পাওয়া যাইবে? শেষে ভাবিলাম, আমার আত্মীয় কিশোরী বাবুর কন্যার সঙ্গে সেন মহাশয়ের বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। মনে মনে এরূপ স্থির করিয়া কেশব বাবুর নিকট অসবর্ণ বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। তিনি প্রফুল্ল মনে আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহের আরম্ভ হইল।”

৺কিশোরীচাঁদ মৈত্রেয় মহাশয় বিজয়কৃষ্ণের ভগিনীপতি ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের আকর্ষণেই তিনি সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজে আসেন। বিজয়কৃষ্ণ আপনার ভাগিনেয়ীরই অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। তখন ৺ভাই প্রসন্নকুমার সেন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া প্রচারব্রত-গ্রহণে উদ্যত হইয়াছিলেন। প্রসন্নবাবু কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গেই কিশোরী বাবুর কন্যার বিবাহ হয়। বিজয়কৃষ্ণই ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ যখন যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেন, তখনই তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। কোনও প্রকারের ফলাফল-চিন্তা তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিত না। উপবীত-ত্যাগ যেই কর্ত্তব্য বোধ হইল, তখনি তিনি তাহা ফেলিয়া দিলেন। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করা যখনই কর্ত্তব্য বোধ হইল, অমনি আপনার ভাগিনেয়ীটীর সঙ্গে প্রসন্ন বাবুর বিবাহ দিলেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে জাতিভেদের চিহ্ন-রূপে যাঁরা উপবীত ধারণ করিতেন, তাঁহাদের বৃত হওয়া বা বৃত থাকা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে ধর্ম্মের ঘরে অধর্ম্মের, সত্যের মন্দিরে অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, যেই বিজয়কৃষ্ণের মনে এই ভাবনার উদয় হইল, তিনি অমনি অকুতোভয়ে তাহার প্রতিবাদ করিলেন। আর তাঁহার নিজের জীবনের এই দুইটি ঘটনা হইতেই ব্রাহ্মসমাজে প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিষম বিরোধ বাধিয়া উঠিল।

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	পঙ্‌ক্তি	উপর বা নীচে হইতে	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০	১০	উ	সম্পদ্	সম্বন্ধ
২০	১৩	উ	অঙ্গীবর	অঙ্গীর
৩২	২	নী	যৌবন	যৌন
৩৭	৮	নী	আত্মার	আত্মপর
৭২	৮	উ	আস্তিক্য একটা বুদ্ধির	আস্তিক্য বুদ্ধির একটা
৭৩	১১	উ	পাট	পাঠ
৭৯	৭	উ	প্রতি-বাক্য	শ্রুতি- ।ক্য
৭৯	৭	নী	জগদাতীত	জগদতীত
৮২	১১	উ	ক্বচিৎ	কথা ক্বচিৎ
৮৮	১১	নী	মৌন	যৌন
৮৯	৫	নী	সকল	বলিয়াছি, সকল
৯৪	৯	নী	শঙ্কর	শাঙ্কর
৯৬	১১	নী	প্রধাননুরাগীর	প্রথানুরাগীর

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত

যুগ-গুরু

জ্ঞানের উৎস—প্রেমের ফল্গু প্রস্রবণ—ভারতীয় দর্শন ও জীবন-সাধনার মর্ম্ম-কথায় পরিপূর্ণ।

ভারতকে জানিতে হইলে, ভারতের জাতীয় চিন্তা ও জীবনের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে হইলে, ভারতের ধারাবাহিক অধ্যাত্ম গুরু ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের ইতিহাস ও বৈদ্যুতিক প্রেরণাময়ী মর্ম্মবাণী শ্রদ্ধালু হৃদয়ে অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করিতে হইবে। সেই পুণ্য সাধনার জীবন্ত আলেখ্য "যুগ-গুরু"—ভারতের প্রকৃত জাতি-নির্ম্মাতৃগণের ইহা অপূর্ব্ব জীবনী-কোষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, নিম্বার্ক, রামানন্দ তুকারাম, রামদাস, কবীর, বল্লভাচার্য্য, নানক, শিখগুরুগণ এবং শ্রীচৈতন্য হইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত বাংলার ধর্ম্মাচার্য্যগণের বিদ্যুন্ময়ী কাহিনী ও প্রেরণার সহিত জীবন্তভাবে পরিচিত হউন। "যুগগুরু"—তাহারই অভিনব উপাদান। মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত

স্বামী বিবেকানন্দ মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম্মে নববিদ্যুৎ বীর্য্য সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাই তিনি যুগাচার্য্য। ঠাকুরের মর্ম্মছেঁড়া সাধনার সিদ্ধমূর্ত্তি, নবভারতের প্রাণদাতা নরেন্দ্রনাথ কেমন করিয়া বিবেকানন্দে পরিণত হইলেন—সেই যুগ-সাধনার কেন্দ্রচক্র 'রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ' কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল, তাহারই জলন্ত ইতিহাস মতিবাবুর অগ্নিময়ী লেখনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ২য় সংস্করণ—মূল্য বাঁধাই ১॥০ টাকা।

শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন

যিনি নবযুগের মহাবতার, ভারত-তত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিগ্রহ তাঁহার জীবনের এই মহিমাময় ও অন্তরঙ্গ দিকটি এ পর্য্যন্ত এমনভাবে কেহ আলোচনা করেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ত্যাগ ও তপস্যার জলন্ত আদর্শ ভিত্তি করিয়া পবিত্র দাম্পত্য-জীবনের যে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার গভীর নিগূঢ় মর্ম্ম, অমৃতময়ী শিক্ষা, সাধনার দৃষ্টি দিয়া নিপুণভাবে উদ্ঘাটিত ও আলোচিত হইয়াছে—ভবিষ্য সমাজ-সৃষ্টির ইহ সিদ্ধ সঙ্কেত। চিত্রে সুশোভিত, ১৫০ পৃষ্ঠার বই বাঁধাই দাম ১।০ আনা